টেনিদা সমগ্র

চার মূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

- মেসোমশায়ের অট্টহাসি 2
- যোগ-সর্পের হাঁড়ি 10
- কলার খোসা 21
- ঝন্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরা 24
- চলমান জুতো 29
- রোমাঞ্চকর রাত 35
- কে তুমি হাস্যময়? 42
- ‘ছপ্পর পর কৌয়া নাচে’ 49
- কাঠবেড়ালির ল্যাজ নয় রে ওটা কাহার দাড়ি! 55
- নস্যু কচাং কুঃ 62
- গজেশ্বরের পাল্লায় 68
- শেঠ ঢুণ্ডুরাম 74
- বাঘা কাণ্ড 81
- হাবুল সেনের মৃতদেহ 87
- চিড়িয়া ভাগল বা 93
- মোক্ষম লাড্ডু 100
- খেল খতম! 107

মেসোমশায়ের অট্টহাসি

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

চাটুজ্যেদের রোয়াকে আমাদের আড্ডা জমেছে। আমরা তিনজন আছি। সভাপতি টেনিদা, হাবুল সেন, আর আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে—পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই। আমাদের চতুর্থ সদস্য ক্যাবলা এখনও এসে পৌঁছয়নি।

চারজনে পরীক্ষা দিয়েছি। লেখাপড়ায় ক্যাবলা সবচেয়ে ভালো—হেডমাস্টার বলেছেন। ও নাকি স্কলারশিপ পাবে। ঢাকাই বাঙাল হাবুল সেনটাও পেরিয়ে যাবে ফাস্ট ডিভিশনে। আমি দুবার অঙ্কের জন্যে ডিগবাজি খেয়েছি—এবার থার্ড ডিভিশনে পাশ করলেও করতে পারি। আর টেনিদা—

তার কথা না বলাই ভালো। সে ম্যাট্রিক দিয়েছে কে জানে এনট্রান্সও দিয়েছে কি না। এখন স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে—এর পরে হয়তো হায়ার সেকেন্ডারিও দেবে। স্কুলের ক্লাস টেন-এ সে একেবারে মনুমেন্ট হয়ে বসে আছে—তাকে সেখান থেকে টেনে এক ইঞ্চি নড়ায় সাধ্য কার!

টেনিদা বলে, হেঁ—হেঁ-বুঝলিনে? ক্লাসে দু-একজন পুরনো লোক থাকা ভালো মানে, সব জানে-টানে আর কি! নতুন ছছাকরাদের একটু ম্যানেজ করা চাই তো!

তা নতুন ছেলেরা ম্যানেজ হচ্ছে বইকি। এমনকি টেনিদার দুদে বড়দা—যাঁর হাঁক শুনলে আমরা পালাতে পথ পাই না, তিনি সুষ্ঠু ম্যানেজড় হয়ে এসেছেন বলতে গেলে। তিন-চার বছর আগেও টেনিদার ফেলের খবর এলে চেঁচিয়ে হাট বাধাতেন, আর টেনিদার মগজে ক-আউন্স, গোবর আছে তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। এখন তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। টেনিদার ফেল করাটা তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে

যে, হঠাৎ যদি পাশ করে ফেলে তা হলে সেইসঙ্গে তিনি একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়বেন।

অতএব নিশ্চিন্তে আড্ডা চলছে।

ওরই মধ্যে হতভাগ্য হাবুলটা একবার পরীক্ষার কথা তুলেছিল, টেনিদা নাক কুঁচকে বলেছিল, নেঃ–নেঃ–রেখে দে! পরীক্ষা-ফরীক্ষা সব জোচ্চুরি! কতকগুলো গাধা ছেলে গাদাগাদা বই মুখস্থ করে আর টকাটক পাশ করে যায়। পাশ না করতে পারাই সবচেয়ে শক্ত। দ্যাখ না বছরের পর বছর হলে গিয়ে বসছি, সব পেপারের অ্যাঁনসার লিখছি–তবু দ্যাখ কেউ আমাকে পাশ করাতে পারছে না। সব এগজামিনারকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। বুঝলি, আসল বাহাদুরি এখানেই।

আমি বললাম, যা বলেছ। এইজন্যেই তো দুবছর তোমার শাগরেদি করছি। ছোটকাকা কান দুটো টেনে-টেনে প্রায় আধ-হাত লম্বা করে দিয়েছে–তবু ইস্কুল কামড়ে ঠিক বসে আছি!

টেনিদা বললে, চুপ কর, মেলা বকিসনি! তোর ওপরে আমার আশা-ভরসা ছিল–ভেবেছিলুম, আমার মনের মতো শিষ্য হতে পারবি তুই। কিন্তু দেখছি তুই এক-নম্বর বিশ্বাসঘাতক! কোন্ আক্কেলে অঙ্কের খাতায় ছত্রিশ নম্বর শুদ্ধ করে ফেললি? আর ফেললিই যদি, ঢ্যারা দিয়ে কেটে এলিনে কেন?

আমি ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, ভারি ভুল হয়ে গেছে!

টেনিদা বললে, দুনিয়াটাই নেমকহারাম! মরুক গে! কিন্তু এখন কী করা যায় বল দিকি? পরীক্ষার পর স্রেফ কলকাতায় বসে ভ্যারেন্ডা ভাজব? একটু বেড়াতে-টেড়াতে না গেলে কি ভালো লাগে?

আমি খুশি হয়ে বললাম, বেশ তো চলো না। লিলুয়ায় আমার রাঙা-পিসিমার বাড়ি আছে–দুদিন সেখানে বেশ হই-হল্লা করে–

-থাম বলছি প্যালা—থামলি?-টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, যেমন তোর ছাগলের। মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি ছাগলের মতো বুদ্ধি! লিলুয়া! আহা ভেবে-চিন্তে কী একখানা জায়গাই বের করলেন! তার চেয়ে হাতিবাগান বাজারে গেলে ক্ষতি কী? ছাতের ওপরে উঠে হাওয়া খেলেই বা ঠ্যাকাচ্ছে কে? যতসব পিলে রুগি নিয়ে পড়া গেছে, রামোঃ!

হাবুল সেন চিন্তা করে বললে, আর অ্যাঁকটা জায়গায় যাওন যায়। বর্ধমানে যাইবা? সেইখানে আমার বড়মামা হইল গিয়া পুলিশের ডি. এস. পি-

দুদ্দুর। সেই ধ্যাড়ধেড়ে বর্ধমান?-টেনিদা নাক কোঁচকাল : ট্রেনে চেপেছিস কি রক্ষে নেই বর্ধমানে যেতেই হবে। মানে, যে-গাড়িতেই চড়বি—ঠিক বর্ধমানে নিয়ে যাবে। সেই রেলের ঝকঝক আর পি পিঁ—প্ল্যাটফর্মে যেন রথের মেলা! তবে চাঁদির ওপরটা একবার চুলকে নিয়ে টেনিদা বললে—তবে হ্যাঁ-সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায় বটে। সেদিক থেকে বর্ধমানের প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যেতে পারে বইকি। অন্তত লিলুয়ার চাইতে ঢের ভালো।

রাঙা-পিসিমার বাড়িকে অপমান! আমার ভারি রাগ হল।

বললাম, সে তো ভালোই হয়। তবে, বর্ধমানের মশার সাইজ প্রায় চড়ুই পাখির মতো, তাদের গোটাকয়েক মশারিতে ঢুকলে সীতাভোগ মিহিদানার মতো তোমাকেই ফলার করে ফেলবে। তা ছাড়া আমি বলে চললাম—আরও আছে। শুনলে তো, হাবুলের মামা ডি. এস. পি.। ওখানে যদি কারও সঙ্গে মারামারি বাধিয়েছ তা হলে আর কথা নেই সঙ্গে সঙ্গে হাজতে পুরে দেবে।

টেনিদা দমে গিয়ে বললে, যাঃ-যাঃ-মেলা বকিনি! কী রে হাবুল—তোর মামা কেমন লোক?

হাবুল ভেবে-টেবে বললে, তা, প্যালা নিতান্ত মিথ্যা কথা কয় নাই! আমার মামায় আবার মিলিটারিতে আছিল মিলিটারি মেজাজ

—এই সেরেছে! না—এ ঢাকার বাঙালটাকে নিয়ে পিরবার জো নেই! ওসব বিপজ্জনক মামার কাছে খামকা মরতে যাওয়া কেন? দিব্যি আছি-মিথ্যে ফ্যাচাঙের ভেতরে কে পড়তে চায় বাপু!

আলোচনাটা এ-পর্যন্ত এসেছে—হঠাৎ বেগে ক্যাবলার প্রবেশ। হাতে একঠোঙা আলুকাবলি।

—এই যে ক্যাবলা এসে পড়েছে। বলেই টেনিদা লাফিয়ে উঠল, তারপরেই চিলের মতো ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে কেড়ে নিলে আলু কাবলির ঠোঙাটা। প্রায় আদ্ধেকটা একেবারে মুখে পুরে দিয়ে বললে, কোথেকে কিনলি রে? তোফা বানিয়েছে তো!

আলুকাবলির শোকে ক্যাবলাকে বিমর্ষ হতে দেখা গেল না। বরং ভারি খুশি হয়ে বললে, মোড়ের মাথায় একটা লোক বিক্রি করছিল।

—এখনও আছে লোকটা? আরও আনা-চারেক নিয়ে আয় না! ক্যাবলা বললে, ধ্যাৎ, আলুকাবলি কেন? পোলাও-মুরগি চিংড়ির কাটলেট—আনারসের চাটনি-দই রসগোল্লা

টেনিদা বললে, ইস, ইস,—আর বলিসনি! এমনিতেই পেট চুঁই- ছুঁই করছে, তার ওপরে ওসব বললে একদম হার্টফেল করব।

ক্যাবলা হেসে বললে, হার্টফেল করলে তুমিই পস্তাবে! আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে এসবই রান্না হচ্ছে কিনা! আর মা তোমাদের তিনজনকে নেমন্তন্ন করতে বলে দিয়েছেন।

শুনে আমরা তিনজনেই একেবারে থ! পুরা তিন মিনিট মুখ দিয়ে একটা রা বেরুলো।

তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে টেনিদা বললে, সত্যি বলছিস ক্যাবলা সত্যি বলছিস? রসিকতা করছিস না তো?

ক্যাবলা বললে, রসিকতা করব কেন? রাঁচি থেকে মেসোমশাই এসেছেন যে তিনিই তো বাজার করে আনলেন।

আর মুরগি? মুরগি আছে তো? দেখিস ক্যাবলা বামুনকে আশা দিয়ে নিরাশ করিসনি! পরজন্মে তাহলে তোকে কিন্তু মুরগি হয়ে জন্মাতে হবে—খেয়াল থাকে যেন!

—সে-ভাবনা নেই। আধ-ডজন দড়িবাঁধা মুরগি উঠনে ক্যাঁক্যাঁ করছে দেখে এলাম।

ট্রিম-ট্রিম—ট্রা—লা—লা—লা—লা—

টেনিদা আনন্দে নেচে উঠল। সেইসঙ্গে আমরা তিনজন কোরাস ধরলাম। গলি দিয়ে একটি নেড়ি কুকুর আসছিল—সেটা ঘ্যাঁক করে একটা ডাক দিয়েই ল্যাজ গুটিয়ে উল্টোদিকে ছুটে পালাল।

রাত্তিরে খাওয়ার যা ব্যবস্থা হল—সে আর কী বলব। টেনিদার খাওয়ার বহর দেখে মনে হচ্ছিল, এর পরে ও আর এমনি উঠতে পারবে না—ক্রেনে করে তুলতে হবে। সের-দুই মাংসের সঙ্গে ডজন খানেক কাটলেট তো খেলই-এর পরে প্লেট-ফ্লেটসুষ্ঠু খেতে আরম্ভ করবে এমনি আমার মনে হল।

খাওয়ার টেবিলে আর-একজন মজার মানুষকে পাওয়া গেল। তিনি ক্যাবলার মেসোমশাই। ভদ্রলোক কত গল্পই না জানেন! একবার শিকার করতে গিয়ে বুনো

মোষের ল্যাজ ধরে কেমন বনবন করে ঘুরিয়েছিলেন, সে-গল্প শুনে হাসতে-হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার জো হল। আর-একবার নাকি গাছের ডাল ভেঙে সোজা বাঘের পিঠের উপর পড়ে গিয়েছিলেন বাঘ তাঁকে টপাৎ করে খেয়ে ফেলা দূরের কথা—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান! বোধহয় ভেবেছিল তাকে ভূতে ধরেছে। এমনকি সবাই মিলে জলজ্যান্ত বাঘকে যখন খাঁচায় পুরে ফেলল—তখনও তার জ্ঞান হয়নি। শেষকালে নাকি স্মেলিং সল্ট শুকিয়ে আর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তবে বাঘের মূছা ভাঙাতে হয়।

খাওয়ার পর ক্যাবলাদের ছাতে বসে এইসব গল্প হচ্ছিল। ইজি-চেয়ারে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে গল্প বলছিলেন ক্যাবলার মেসোমশাই—আর আমরা মাদুরে বসে শুনছিলাম। মেসোমশাইয়ের টাকের ওপর চাঁদের আলো চিকচিক করছিল-থেকে-থেকে লালচে আগুনে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তাঁর মুখখানা।

মেসোমশাই বললেন, ছুটিতে বেড়াতে যেতে চাও? আমি এক-জায়গায় যাওয়ার কথা বলতে পারি। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা আশেপাশে বেশি নেই।

ক্যাবলা বললে, রাঁচি?

মেসোমশাই বললেন, না—না, এখন বেজায় গরম পড়ে গেছে ওখানে? তা ছাড়া বড় ভিড়—ও সুবিধে হবে না।

টেনিদা বললে, দার্জিলিং, না শিলং?

মেসোমশাই বললেন, বেজায় শীত? গরমে পুড়তে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শীতে জমে যেতেই বা কী সুখ, সে আমি ভেবে পাইনে। ও- সব নয়।

আমার একটা কিছু বলার দরকার এখন। কিন্তু কিছুই মনে এল না। ফস করে বলে বসলাম, তা হলে গোবরডাঙা?

-চুপ কর বলছি প্যালা—চুপ কর!-টেনিদা দাঁত খিচোল—নিজে এক-নম্বর গোবরগণেশ-গোবরডাঙা আর লিলুয়া ছাড়া আর কী বা খুঁজে পাবি?

মেসোমশাই বললেন, থামোথামো। ও-সব নয় আমি যে-জায়গার কথা বলছি, কলকাতার লোকে তার এখনও খবর রাখে না। জায়গাটা রাঁচির কাছাকাছি বটেহাজারিবাগ আর রামগড় থেকে সেখানে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি চড়ে মাইল-তিনেক পথ। ভারি সুন্দর জায়গা-শাল আর মহুয়ার বন, একটা লেক। রয়েছে তাতে টলচলে নীল জল। দিনের বেলাতেই হরিণ দেখা যায়-খরগোশ আর বন-মুরগি ঘুরে বেড়ায়। কাছেই সাঁওতালদের বস্তি, দুধ আর মাংস খুব শস্তায় পাওয়া যায়—লেকেও কিছু মাছ আছে—দু-পয়সা চার পয়সা সের। আর সেইখানে পাহাড়ের একটা টিলার ওপর একটা খাসা বাংলো আমি কিনেছি। বাংলোটা এক সাহেব তৈরি করিয়েছিল বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে বেচে দিয়ে গেছে। চমৎকার বাংলো! তার বারান্দায় বসে কতদূর পর্যন্ত যে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক নেই। পাশেই ঝরনা বারো মাস তিরতির করে জল বইছে। ওখানে গিয়ে যদি একমাস থাকো—এই রোগা প্যাঁকাটির দল সব একেবারে ভীম-ভবানী হয়ে ফিরে আসবে।

টেনিদা পাহাড় প্রমাণ আহার করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়েছিল, তড়াক করে উঠে বসল।

—আমরা যাব! আমরা চারজনেই!

মেসোমশাই আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সে তত ভালো কথাই। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে!

-কী মুস্কিল?

–কথাটা হল—ইয়ে—মানে বাড়িটার কিছু গোলমাল আছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

–গোলমাল কিসের?

–ওখানকার সাঁওতালেরা বলে, বাড়িটা নাকি দাননা-পাওয়া। ওখানে নাকি অপদেবতার উপদ্রব হয় মধ্যে-মধ্যে। কে যেন দুম-দাম করে হেঁটে বেড়ায়–অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে–অথচ কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য বাড়িটা কেনবার পরে মাত্র বার-তিনেক গেছি–তাও সকালে পৌঁছেছি, আর সন্ধেবেলায় চলে এসেছি। কাজেই রাত্তিরে ওখানে কী হয় না হয় কিছুই টের পাইনি। তাই ভাবছি-ওখানে যেতে তোমাদের সাহসে কুলোবে কি না।

টেনিদা বললে, ছোঃ! ওসব বাজে কথা! ভূত-টুত বলে কিছু নেই মেসোমশাই। আমরা চারজনেই যাব। ভূত যদি থাকেই, তাহলে তাকে একেবারে রাঁচির পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসব কলকাতায়। আর

কিন্তু তারপরেই আর কিছু বলতে পারল না টেনিদা হঠাৎ থমকে গিয়ে দুহাতে হারুল সেনকে প্রাণপণে জাপটে ধরল।

হাবুল ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আহা-হা কর কী, ছাইড়্যা দাও, ছাইড়া দাও! গলা পর্যন্ত খাইছি, প্যাটটা ফ্যাইটা যাইব যে!

টেনিদা তবু ছাড়ে না। আরও শক্ত করে হাবুলকে জাপটে ধরে বললে, ও কী–ও কীবাড়ির ছাতে ও কী!

আকাশে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে একফালি কালো মেঘের আড়ালে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে পাশের বাড়িতে ছাতে কার যেন দুটো অমানুষিক চোখ দপদপ করে জ্বলছে।

আর সেই মুহূর্তে ক্যাবলার মেসোমশাই আকাশ ফাটিয়ে প্রচণ্ড অট্টহাসি করে উঠলেন। সে-হাসিতে আমার কান বোঁ-বোঁ করে উঠল, পেটের মধ্যে খটখটিয়ে

নড়ে উঠল পালাজ্বরের পিলে—মনে হল মুরগি-টুরগিগুলো বুঝি পেট-ফেট চিরে কঁক করতে করতে বেরিয়ে আসবে।

এমন বিরাট কিস্তুত অট্টহাসি জীবনে আর কখনও শুনিনি।

যোগ-সর্পের হাঁড়ি

একে তো ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের ওই উকট অট্টহাসি—তারপর আবার পাশের বাড়ির ছাতে দুটো আগুন-মাখা চোখ! জয় মা কালী বলে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাব ভাবছি, এমন সময় মিয়াঁও-মিয়াঁও—মিয়াঁও

সেই জ্বলন্ত চোখের মালিক এক লাফে ছাতের পাঁচিলে উঠে পড়ল, তারপর আর-এক লাফে আর-এক বাড়ির কার্নিশে।

পৈশাচিক অট্টহাসিটা থামিয়ে মেসোমশাই বললেন, একটা হুলো-বেড়াল দেখেই চোখ কপালে উঠল, তোমরা যাবে সেই ডাক বাংলোয়!—ভেংচি কাটার মতো করে আবার খানিকটা খ্যাঁকঘেঁকে হাসি হাসলেন ভদ্রলোক :বীর কী আর গাছে ফলে!

আমাদের ভেতর ক্যাবলাটা বোধহয় ভয়-টয় বিশেষ পায়নি—এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বললে, না—পটোলের মতো পটলডাঙায় ফলে।

টেনিদার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হাবুল হাঁসফাঁস করে বললে, কিংবা ঢ্যাঁড়সের মতন গাছের ওপর ফলে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল : কিংবা চালের ওপর চালকুমড়োর মতো ফলে।

টেনিদা দম নিচ্ছিল এতক্ষণ, এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,—থাম থাম সব বাজে বকিসনি! সত্যি বলছি মেসোমশাই ইয়ে—আমরা একদম ভয় পাইনি। এই প্যালাটা বেজায় ভিতু কিনা, তাই ওকে একটু ঠাট্টা করছিলাম।

বা রে, মজা মন্দ নয় তো! শেষকালে আমার ঘাড়েই চালাবার চেষ্টা। আমার ভীষণ রাগ হল। আমি ছাগলের মতো মুখ করে বললাম, না মেসোমশাই, আমি মোটে ভয় পাইনি। টেনিদার দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছিল কিনা, তাই চেঁচিয়ে ওকে সাহস দিচ্ছিলাম।

—ইঃ, সাহস দিচ্ছিল। ওরে আমার পাকা পালোয়ান রে!—টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে আমের মোরব্বার মতো করে বললে, দ্যাখ প্যালা, বেশি জ্যাঠামি করবি তো এক। চড়ে তোর কান দুটোকে কানপুরে পাঠিয়ে দেব!

মেসোমশাই বললেন, আচ্ছা থাক, থাক। তোমরা যে বীরপুরুষ এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আসল কথা হোক। তোমরা কি সত্যিই ঝন্টিপাহাড়ে যেতে চাও?

ঝন্টিপাহাড়! সে আবার কোথায়? যা-বাব্বা, সেখানে মরতে যাব কেন?—টেনিদা চটাং করে বলে ফেলল।

মেসোমশাই বললেন, কী আশ্চর্য—এক্ষুনি তো সেখানে যাওয়ার কথা হচ্ছিল।

-তাই নাকি?—টেনিদা মাথা চুলকে বললে, বুঝতে পারিনি। তবে কিনাঝন্টিপাহাড় নামটা, কী বলে ইয়ে—তেমন ভালো নয়।

হাবুল বললে, হ, বড়ই বদখত।

আমি বললাম, শুনলেই মনে হয় ব্রহ্মদৈত্য আছে।

মেসোমশাই আবার খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বললেন, তার মানে তোমরা যাবে না? ভয় ধরছে বুঝি?

টেনিদা এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সাঁ করে একটা বুকডন দিয়ে বললে, ভয়? দুনিয়ায় আছে বলে আমি জানিনে! নিজের বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, কেউ না যায় হাম জায়েঙ্গা! একাই জায়েঙ্গা!

ক্যাবলা বললে, আর যখন ভূতে ধরেঙ্গা?

–তখন ভূতকে চাটনি বানিয়ে খায়েঙ্গা!–টেনিদা বীররসে চাগিয়ে উঠল :সত্যি, কেউ যায় আমি একাই যাব! হঠাৎ আমার ভারি উৎসাহ হল।

–আমিও যাব।

ক্যাবলা বললে, আমিও!

হাবুল, সেন ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, আমিও জামু!

মেসোমশাই বললেন, তোমরা ভয় পাবে না?

টেনিদা বুক চিতিয়ে বললেন, একদম না!

আমিও ওই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা একটা ফোড়ন কেটে দিলে তবে, রাত্তিরবেলা হুলোবেড়াল দেখলে কী হবে কিছুই বলা যায় না।

মেসোমশাই আবার ছাত-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠলেন। টেনিদা গর্জন করে বললে, দ্যাখ ক্যাবলা, বেশি বকবক করবি তো এক ঘুষিতে তোর নাক–

আমি জুড়ে দিলাম : নাসিকে পাঠিয়ে দেব।

–যা বলেছিস! একখানা কথার মতো কথা।–এই বলে টেনিদা এমনভাবে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে যে, আমি উহু-উহু শব্দে চেঁচিয়ে উঠলাম।

তার পরের খানিকটা ঘটনা সংক্ষেপে বলে যাব। কেমন করে আমরা চার মূর্তি বাড়ি থেকে পারমিশন আদায় করলাম সে-সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সেসব এলাহি কাণ্ড এখন থাক। মোট কথা, এর তিনদিন পরে, কাঁধে চারটে সুটকেশ আর বগলে চারটে সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা নিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুলাম।

ট্রেন প্রায় ফাঁকাই ছিল। এই গরমে নেহাত মাথা খারাপ না হলে আর কে রাঁচি যায়? ফাঁকা একটা ইন্টার ক্লাস দেখে আমরা উঠে পড়লাম, তারপর চারটে বিছানা পেতে নিলাম।

ভাবলাম, বেশ আরামে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি, হঠাৎ টেনিদা ডাকল—এই প্যালা!

—আবার কী হল!

-ভারি খিদে পেয়েছে মাইরি! পেটের ভেতর যেন একপাল ছুঁচো বক্সিং করছে।

বললাম, সে কী এই তো বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে প্রায় তিরিশখানা লুচি আর সের-টাক মাংস সাবাড় করে এলে! গেল কোথায় সেগুলো?

হাবুল বললে, তোমার প্যাটে ভস্মকীট ঢুইক্যা বসছে!

টেনিদা বললে, যা বলেছিস! ভস্মকীটই বটে! যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ ভস্ম হয়ে যায়! বলেই দরাজভাবে হাসল : বামুনের ছেলে, বুঝলিসাক্ষাৎ অগস্ত্য মুনির বংশধর! বাতাপি ও ইল-ফিশ্বল যা ঢুকবে দেন-অ্যান্ড-দেয়ার হজম হয়ে যাবে! হুঁ হুঁ!—এরই নাম ব্রহ্মতেজ।

ক্যাবলা বলে বসল : ঘোড়ার ডিমের বামুন তুমি! পৈতে আছে তোমার?

—পৈতে? টেনিদা একটা ঢোক গিলল : ইয়ে, ব্যাপারটা কী জানিস? গরমের সময় পিঠ চুলকোতে গিয়ে কেমন পটাং করে ছিড়ে যায়। তা আদত বামুনের আর পৈতের দরকার কী, ব্রহ্মতেজ থাকলেই হল। কিন্তু সত্যি, কী করা যায় বল তো? পেটের ভেতর ছুঁচোগুলো যে রেগুলার হাডু-ডু খেলছে!

ক্যাবলা বললে, তা আর কী করবে! তুমি রেফারিগিরি করো।

কী বললি ক্যাবলা?

কী আর বলব—কিছুই বলিনি বলেই ক্যাবলা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল।

হাবুল সেন এর মধ্যে বলে বসল, প্যাটে কিল মাইরা বইস্যা থাকো।

কার পেটে কিল মারব? তোর?বলে ঘুষি বাগিয়ে টেনিদা উঠে পড়ে আর কি!

হাবুল চটপট বলে বসল, আমার না—আমার না—প্যালার।

বা-রে, এ তো বেশ মজা দেখছি! মিছিমিছি আমি কেন পেটে কিল খেতে যাই? তোক করে একটা বাঙ্কের ওপর উঠে বসে আমি বললাম, আমি কেন কিল খাব? কী দরকার আমার?

টেনিদা বললে, খেতেই হবে তোকে! হয় আমায় যা-হোক কিছু খাওয়া, নইলে শুধু কিল কেন—রাম-কিল আছে তোর বরাতে। ওই তো কত ফিরিওলা যাচ্ছে—ডাক না একটাকে। পুরি কচৌরি, কমলালেবু চকোলেট-ডালমুট

আমি তো দেখছি একটা জুতো-ব্রাশ যাচ্ছে। ওকেই ডাকব?—আমি নিরীহ গলায় জানতে চাইলাম।

www.bengaliebook.com

—তবে রেবলে টেনিদা প্রায় তেড়ে আসছিল আর আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব কি না ভাবছিলুম, এমন সময় ঢনাটন করে ঘণ্টা বাজল। ইঞ্জিনে ভোঁ করে আওয়াজ হল–আর গাড়ি নড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে আর-একজন ঢুকে পড়ল কামরায়, তার হাতে এক প্রকাণ্ড সন্দেহজনক চেহারার হাঁড়ি। আর তক্ষুনি পেছন থেকে কে যেন কী-একটা ছুঁড়ে দিলে –গাড়ির ভেতর। সেটা পড়বি তো পড়, একেবারে টেনিদার ঘাড়ের ওপর। টেনিদা হাঁই-মাই। করে উঠল।

তারপরে চোখ পাকিয়ে এটা কী হল মশাই বলতে গিয়েই স্পিটি নট! সঙ্গে সঙ্গে আমরাও!

গাড়িতে যিনি ঢুকেছেন তাঁর চেহারাখানা দেখবার মতো। একটি দশাসই চেহারার সাধু। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফে মুখ একেবারে ছয়লাপ। গলায় অ্যাঁই মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের তিলক আঁকা, পায়ে শুড়-তোলা নাগরা।

হাতের সন্দেহজনক হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে সাধুবাবা বললেন, ঘাবড়ে যেও না বৎস—ওটা আমার বিছানা। তাড়াহুড়োতে আমার শিষ্য জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। তোমার বিশেষ লাগেনি তো?

—না, তেমন আর কী লেগেছে বাবা! তবে সাতদিনে ঘাড়ের ব্যথা ছাড়লে হয়!—টেনিদা ঘাড় ডলতে লাগল। আমি কিন্তু ভারি খুশি হয়ে গেলাম সাধুবাবার ওপরে। যেমন আমার পেটে কিল মারতে এসেছিল—ববাঝে এবার!

সাধুবাবা হেসে বললেন, একটা বিছানার ঘায়েই কাবু হয়ে পড়লে বৎস, আর আমার কাঁধে একবার একটা আস্ত কাবুলিওয়ালা এক মন হিংয়ের বস্তা নিয়ে বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিল। তবু আমি অক্কা পাইনি—সাতদিন হাসপাতালে থেকেই সামলে নিয়েছিলুম। বুঝেছ বৎস—এরই নাম যোগবল!

–তবে তো আপনি মহাপুরুষ স্যার–দিন দিন পায়ের ধুলো দিন। বলেই টেনিদা ঝাঁ করে সাধুবাবাকে একটা প্রণাম ঠুকে বসল।

সাধু বললেন, ভারি খুশি হলুম–তোমার সুমতি হোক। তা তোমরা কারা? এমন দল বেঁধে চলেছই বা কোথায়?

–প্রভু, আমরা রামগড়ে যাচ্ছি। বেড়াতে। আমার নাম টেনিথুড়ি, ভজহরি মুখুজ্যে। এ হচ্ছে প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে–খালি জ্বরে ভোগে আর পেটে মস্ত একটা পিলে আছে। এ হল হাবুল সেন–যদিও ঢাকাই বাঙাল, কিন্তু আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবে অনেক টাকা চাঁদা দেয়। আর ও হল ক্যাবলা মিত্তির, ক্লাসে টকাটক ফার্স্ট হয় আর ওদের বাড়িতে আমাদের বিস্তর পোলাও-মাংস খাওয়ায়।

-পোলাও-মাংস! আহা–তা বেশ-দাড়ির ভেতরে সাধুবাবা যেন নোলার জল সামলালেন মনে হল : তা বেশ–তা বেশ!

-বাবা, আপনি কোন্ মহাপুরুষ হাবুল, সেন হাত জোড় করে জানতে চাইল।

–আমার নাম? স্বামী ঘুটঘুটানন্দ।

–ঘুটঘুটানন্দ! ওরে বাবা!-ক্যাবলার স্বগতোক্তি শোনা গেল।

–এতেই ঘাবড়ালে বস ক্যাবল? আমার গুরুর নাম কী ছিল জানো? ডমরু-ঢক্কা-পট্টনানন্দ; তাঁর গুরুর নাম ছিল উচ্চ-মার্তণ্ড কুক্কুটডিম্বভর্জন; তাঁর গুরুর নাম ছিল–

–আর বলবেন না প্রভু ঘুটঘুটান–এতেই দম আটকে আসছে। এরপর হার্টফেল করব!বাঙ্কের ওপর থেকে এবার কথাটা বলতেই হল আমাকে।

শুনে ঘুটঘুটানন্দ করুণার হাসি হাসলেন : আহানাবালক! তা, তোমাদের আর দোষ কী–আমার গুরুদেবের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ গুরুর নাম শুনে আমারই দু-দিন ধরে সমানে

www.bengaliebook.com

হিক্কা উঠেছিল। সে যাক—তোমরা চারজন আছ দেখছি, যাবেও রামগড়ে। আমি নামব। মুরিতে—সেখান থেকে রাঁচি। তা বৎসগণ, আমার যোগনিদ্রা একটু প্রবলচট করে ভাঙতে চায় না। মুরিতে গাড়ি ভোরবেলায় পৌঁছয়যদি উঠিয়ে দাও বড় ভাল হয়।

—সেজন্যে ভাববেন না প্রভু, ঘাটশিলাতেই উঠিয়ে দেব আপনাকে।-ক্যাবলা আশ্বাস দিলে।

-না-না বৎস, অত তাড়াতাড়ি জাগাবার দরকার নেই। ঘাটশিলায় মাঝরাত।

—তাহলে টাটানগরে?

—সেটা শেষরাত, বৎস—অজ ব্যস্ত হয়ো না। মুরিতে উঠিয়ে দিলেই চলবে। টেনিদা বললে, আচ্ছা তাই দেব। এবার আপনি যোগনিদ্রায় শুয়ে পড়তে পারেন।

—তা পারি। ঘুটঘুটানন্দ এবার চারিদিকে তাকালেন : কিন্তু শোব কোথায়? চারজনে। তো চারটে নীচের বেঞ্চি দখল করে বসেছ। আমি সন্ন্যাসী মানুষবাঙ্কে উঠলে যোগনিদ্রার ব্যাঘাত হবে।

টেনিদা বললে, আপনি উঠবেন কেন প্রভু—প্যালা বাঙ্কে শোবে। ও ব্যাঙ্কে শুতে ভীষণ ভালবাসে।

দ্যাখো তো কী অন্যায়! বাঙ্কে ওঠা আমি একদম পছন্দ করি না, খালি মনে হয় কখন ছিটকে পড়ে যাব—আর টেনিদা কিনা আমাকেই

আমি বললাম, কক্ষনো নাবাঙ্কে শুতে আমি মোটেই ভালোবাসি না! টেনিদা চোখ পাকাল।

—দ্যাখ প্যালা—সাধু-সন্নিসি নিয়ে ফাজলামো করিসনি-নরকে যাবি! প্রভু, আপনি প্যালার বিছানা ফেলে দিয়ে ওইখানেই লম্বা হোন—প্যালা যেখানে তোক শশাবে।

—আহা, বেঁচে থাকো বৎস বলে ঘুটঘুটানন্দ আমার বিছানা ওপরে তুলে দিয়ে নিজের বিছানাটা পাতলেন। আমি জুলজুল করে চেয়ে রইলাম।

তারপর শোয়ার আগে সেই সন্দেহজনক হাঁড়িটি নিজের বেঞ্চির তলায় টেনে নিলেন। টেনিদা অনেকক্ষণ লক্ষ করছিল, জিজ্ঞেস করল, হাঁড়িতে কী আছে প্রভু?

শুনেই ঘুটঘুটানন্দ চমকে উঠলেন; হাঁড়িতে? হাঁড়িতে বড় ভয়ঙ্কর জিনিস আছে বৎস! যোগসর্প!

—যোগসর্প?—হাবুল বললে, সেইটা আবার কী প্রভু?

ঘুটঘুটানন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! ভীষণ সমস্ত বিষধর সাপ-তপস্যাবলে আমি তাদের বন্দি করে রেখেছি। তারা দুধকলা খায় আর হরিনাম করে।

–সাপে হরিনাম করে!—আমি জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলুম না।

-তপস্যায় সব হয় বৎস! ঘুটঘটানন্দ হাসলেন : তা বলে তোমরা ওর ধারেকাছে যেও! যোগবল না থাকলে বোঁ করে ছোবল মেরে দেবে। সাবধান!

-আজ্ঞে আমরা খুব সাবধানে থাকব-টেনিদা গোবেচারির মতো বললে।

ঘুটাঘুটানন্দ আর-একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, হ্যাঁ, খুব সাবধান! ওই হাঁড়ির দিকে ভুলেও তাকিও না। তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি?

–পড়ুন।

তারপর পাঁচ মিনিট কাটল না। ঘর-ঘ-ঘরাৎ করে ঘুটঘুটানন্দের নাক ডাকতে লাগল।

বাঙ্কের উপরে দুলুনি খেতে খেতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎ কার যেন খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, টেনিদা, আমার পাঁজরায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

—নেমে আয় না গাধাটা। সাধুবাবা জেগে উঠলে তখন লবডঙ্কা পাবি।

চেয়ে দেখি, টেনিদার বিছানার ওপর যোগসর্পের হাঁড়ি। আর তার ঢাকনা খুলে ক্যাবলা আর হাবুল সেন পটাপট রসগোল্লা আর লেডিকেনি সাবড়ে দিচ্ছে।

টেনিদা আবার ফিসফিসিয়ে বললে, হাঁ করে দেখছিস কী? নেমে আয় শিগগির। যোগসপের হাঁড়ি শেষ করে আবার তো মুখ বেঁধে রাখতে হবে।

আর বলবার দরকার ছিল না। একলাফে নেমে পড়লুম এবং এক থাবায় দুটো লেডিকেনি তুলে ফেললুম।

টেনিদা এগিয়ে এসে বললে, দাঁড়া দাঁড়া—সবগুলো মেরে দিসনি! দুটো-একটা আমার জন্যেও রাখিস।

ট্রেন টাটানগর ছেড়ে আবার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বামী ঘুটঘুটানন্দের নাক সমানে ডেকে চলল : ঘরাৎ-ফোঁ—ফর্‌র্‌ ফোঁ-ফুরুৎ-ফুর্‌র্‌-

চারজনে মিলে যেভাবে আমরা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের হাঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, তাতে সেটা চিচিং ফাঁক হতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল না। অর্ধেকের ওপর টেনিদা সাবড়ে দিলে বাকিটা আমি আর হাবুল সেন ম্যানেজ করে নিলুম। বয়েসে ছোট ক্যাবলাই বিশেষ জুত করতে পারল না। গোটা-দুই লেডিকেনি খেয়ে শেষে হাত চাটতে লাগল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

টেনিদা তবু হাঁড়িটাকে ছাড়ে না। শেষকালে মুখের ওপর তুলে চোঁ করে রসটা পর্যন্ত নিকেশ করে দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে বললে, দুত্তোর, গোটাকয়েক ডেয়ো পিঁপড়েও খেয়ে ফেললুম রে! জ্যান্তও ছিল দু-তিনটে! পেটের ভেতরে গিয়ে কামড়াবে না তো?

হাবুল বললে, কামড়াইতেও পারে।

কামড়াক গে, বয়ে গেল! একবার ভীমরুল-সুদ্ধ একটা জামরুল খেয়ে ফেলেছিলুম, তা সে-ই যখন কিছু করতে পারলে না, তখন কটা পিঁপড়েতে আর কী করবে!

—ইচ্ছে করলে গোটাকয়েক বাঘ-সুদ্ধ সুন্দরবন পর্যন্ত তুমি খেয়ে ফেলতে পারো—তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে!—হাত চাটা শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ক্যাবলা।

এর মধ্যে স্বামী ঘুটঘটানন্দের নাক সমানেই ডেকে চলছিল। যোগসিদ্ধ নাক কিনা—সেনাকের ডাকবার কায়দাই আলাদা। ঘ-ঘোঁ-ঘুরৎ!

টেনিদা বললে, যতই ঘুরুৎ-ঘুরুৎ করো না কেন—তোমার হাঁড়ি ফুড়ৎ! চালাকি পেয়েছে। কাঁধের ওপর দেড়মনি বিছানা ফেলে দেওয়া। ঘাড়টা টনটন করছে এখনও। প্রতিশোধ ভালোই নেওয়া হয়েছে কী বলিস প্যালা?

আমি বললুম, প্রতিশোধ বলে প্রতিশোধ! একেবারে নির্মম প্রতিশোধ!

যোগসর্পের শূন্য হাঁড়িটার মুখ টেনিদা বেশ করে বাঁধল। তারপর বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে বললে, এবার একটু ঘুমোনো যাক। পেটের জ্বলুনিটা এতক্ষণে একটু কমেছে।

আমার আর হাবুলেরও তাতে সন্দেহ ছিল না। কেবল ক্যাবলাই গজগজ করতে লাগল : তোমরাই সব খেয়ে নিলে, আমি কিছু পেলুম না!

টেনিদা বললে, যা যা, মেলা বকিসনি। ছেলেমানুষ, বেশি খেয়ে শেষে কি অসুখে পড়বি? নে, চুপচাপ ঘুমো–

ক্যাবলা ঘুমোলো কি না কে জানে, কিন্তু টেনিদার ঘুমোতে দু-মিনিটও লাগল না। স্বামীজীর, নাক বললে, ঘুরুৎ–টেনিদার নাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, ফুড়ৎ। এই উত্তর-প্রত্যুত্তর কতক্ষণ চলল জানি না–মুখের ওপর থেকে দেওয়ালি পোকা তাড়াতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

কলার খোসা

মুরি। মুরি জংশন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতেই দেখি, বাইরে আবছা সকাল। ক্যাবলা কখন উঠে বসে এক ভাঁড় চায়ে মন দিয়েছে। হাবুল সেন দুটো হাই তুলে শশায়া অবস্থাতেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দিকে জুলজুল করে তাকালে। কিন্তু স্বামীজীর নাক তখন বাজছে–গোঁ-গোঁ–আর টেনিদার নাক জবাব দিচ্ছে–ভোঁ-ভোঁ–অর্থাৎ হাঁড়িতে আর কিছুই নেই।

হঠাৎ ক্যাবল টেনিদার পাঁজরায় একটা খোঁচা দিলে।

–অ্যাঁই–অ্যাঁই! কে সুড়িসুড়ি দিচ্ছে র‍্যা?–বলে টেনিদা উঠে বসল। ক্যাবলা বললে, গাড়ি যে মুরিতে প্রায় দশ মিনিট থেমে আছে! স্বামীজীকে জাগাবে না?

টেনিদা একবার হাঁড়ি, আর একবার স্বামীজীর দিকে তাকাল। তারপর বললে, গাড়িটা ছাড়তে আর কত দেরি রে?

–এখুনি ছাড়বে মনে হচ্ছে।

–তা ছাড়ুক। গাড়ি নড়লে তারপর স্বামীজীকে নড়াব। বুঝছিস না, এখন ওঠালে হাঁড়ির অবস্থা দেখে কি আর রক্ষা রাখবে? যা ষণ্ডামাকা চেহারা রসগোল্লার বদলে আমাদেরই জলযোগ করে ফেলবে! তার চেয়ে

টেনিদা আরও কী বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে বাজখাঁই গলায় বিটকেল হাঁক শোনা গেল : প্রভুজী,–কোন্ গাড়িতে আপনি যোগনিদ্রা দিচ্ছেন দেবতা?

সে তো হাঁক নয়–যেন মেঘনাদ! সারা ইস্টিশন কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী ঘুটঘুটান তড়াক করে উঠে বসলেন।

–প্রভুজী, জাগুন! গাড়ি যে ছাড়ল–

অ্যাঁ! এ যে আমারই শিষ্য গজেশ্বর!জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বামীজী ডাকলেন : গজবস গজেশ্বর! এই যে আমি এখানে।

গাড়ির দরজা খটাৎ করে খুলে গেল। আর ভেতরে যে ঢুকল, তার চেহারা দেখেই আমি এক লাফে বাঙ্কে চেপে বসলুম। হাবুল আর টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ল– আর ক্যাবলা কিছু করতে পারল না–তার হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা টপাং করে পড়ে গেল মেঝেতে।

উঁহু হুঁ গেছি-পা পুড়ে গেল রে–স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠলেন। উঃ–ছোঁড়াগুলো কী তাঁদোড়? বলেছিলুম মুরিতে তুলে দিতে–তা দ্যাখো কাণ্ড? একটু হলেই তো ক্যারেড-ওভার হয়ে যেতুম!

গজেশ্বর একবার আমাদের দিকে তাকাল–সেই চাউনিতেই রক্ত জল হয়ে গেল আমাদের। গজেশ্বরের বিরাট চেহারার কাছে অমন দশাসই স্বামীজীও যেন মূর্তিমান প্যাঁকাটি। গায়ের রঙ যেন হাঁড়ির তলার মতো কালো হাতির মতোই প্রকাণ্ড শরীর-মাথাটা ন্যাড়া, তার ওপর হাতখানেক একটা টিকি। গজেশ্বর

কুতকুতে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, আজকাল ছোঁড়াগুলো এমনি হয়েছে প্রভু—যেন কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আমদানি হয়েছে সব! প্রভু যদি অনুমতি করেন, তা হলে এদের কানগুলো একবার পেঁচিয়ে দিই!

গজেশ্বর কান প্যাঁচাতে এলে আর দেখতে হবে না কান উপড়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা চারজন ভয়ে তখন পান্তুয়া হয়ে আছি! কিন্তু বরাত ভালো-সঙ্গে-সঙ্গে টিন-টিন করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

গজের ব্যস্ত হয়ে বললে, নামুননামুন প্রভু! গাড়ি যে ছাড়ল! এদের কানের ব্যবস্থা এখন মুলতুবি রইলসময় পেলে পরে দেখা যাবে এখন! নামুন–আর সময় নেই–

বাক্স-বিছানা, মায় স্বামীজীকে প্রায় ঘাড়ে তুলে গজেশ্বর নেমে গেল গাড়ি থেকে। সেই সঙ্গেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করে দিল।

আমরা তখনও ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি–গজেশ্বরের হাতির শুড়ের মতো প্রকাণ্ড হাতটা তখনও আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। মস্ত ফাঁড়া কাটল একটা!

কিন্তু ট্রেন হাতকয়েক এগোতেই স্বামীজী হঠাৎ হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন : হাঁড়ি–আমার রসগোল্লার হাঁড়ি–

সঙ্গে সঙ্গেই টেনিদা হাঁড়িটা তুলে ধরল, বললে, ভুল বলছেন প্রভু, রসগোল্লা নয়, যোগসর্প! এই নিন–

বলেই হাঁড়িটা ছুঁড়ে দিলে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

–আহা-আহাকরে দু-পা ছুটে এসেই স্বামীজী থমকে দাঁড়ালেন। হাঁড়ি ভেঙে চুরমার। কিন্তু আধখানা রসগোল্লাও তাতে নেই–সিকিখানা লেডিকেনি পর্যন্ত না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

–প্রভু, আপনার যোগসর্প সব পালিয়েছে–আমি চিৎকার করে বললুম। এখন আর ভয় কিসের!

কিন্তু এ কী–এ কী! হাতির মতো পা ফেলে গজেশ্বর যে দৌড়ে আসছে! তার কুতকুতে চোখ দিয়ে যেন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে! এ যেন ট্রেনের চাইতেও জোরে ছুটছে কামরাটা প্রায় ধরে ফেললে।

আমি আবার বাঙ্কে উঠতে যাচ্ছি–টেনিদা ছুটেছে বাথরুমের দিকে–সেই মুহূর্তে–ভগবানের দান! একটা কলার খোসা!

হড়াৎ করে পা পিছলে সোজা প্ল্যাটফর্মে চিত হল গজেশ্বর। সে তো পড়া নয়–মহাপতন যেনমনখানেক খোয়া বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে পড়ল আশেপাশে।

–গেল–গেল–চিকার উঠল চারপাশে। কিন্তু গজেশ্বর কোথাও গেল –প্ল্যাটফর্মের ওপর সেকেণ্ড পাঁচেক পড়ে থেকেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়াল-

-খুব বেঁচে গেলি!–দূর থেকে গজেশ্বরের হতাশ হুঙ্কার শোনা গেল।

গাড়ি তখন পুরো দমে ছুটতে শুরু করেছে। টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হরি হে, তুমিই সত্য।

ঝন্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরা

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। গজেশ্বরের সেই আছাড়-খাওয়া নিয়ে খুব হাসাহাসি করলুম আমরা। অত বড় হাতির মতো লোকটা পড়ে গেল একেবারে ঘটোৎকচের মতো! তবে আমাদের ওপর চেপে পড়লে কী যে হত, সেইটেই ভাববার কথা।

হাবুল বললে, আর একটু হইলেই প্রায় উইঠ্যা পড়ছিল গাড়িতে! মাইরা আমাগো ছাতু। কইরা দিত।

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে হাবলাকে ভেংচে বললে, হঃ-হঃ-ছাতু কইরা দিত! বললেই। হল আর-কি! আমিও পটলডাঙার টেনি মুখুজ্যে—অ্যাঁয়স্যা একখানা জুজুৎসু হাঁকড়ে দিতুম যে মুরি তো মুরি—বাছাধন একেবারে মুড়ি হয়ে যেত! চ্যাপটাও হতে পারত চিড়ের মতো!

শুনে ক্যাবলা খিকখিক করে হাসল।

—অ্যাঁই ক্যাবলা, হাসছিস যে? টেনিদার সিংহনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা কী ঘুঘু! সঙ্গে সঙ্গেই বললে, আমি হাসিনি তো—প্যালা হাসছে।

—প্যালা–!

বা—আমি হাসতে যাব কেন? যোগসর্পের হুঁড়ির লেডিকেনি খেয়ে সেই তখন থেকে আমার পেট কামড়াচ্ছে। আমার পেটেও গোটাকয়েক ডেয়ো পিঁপড়ে ঢুকেছে কিনা কে জানে! মুখ ব্যাজার করে বললাম, আমি হাসব কেনকী দায় পড়েছে আমার হাসতে!

টেনিদা বললে, খবরদার—মনে থাকে যেন! খামকা যদি হাসবি তাহলে তোর ওই মূল্যের মতো দাঁতগুলো পটাপট উপড়ে দেব! ইসস, ব্যাটা গজেশ্বর বড় বেঁচে গেল! একবার ট্রেনে উঠে এলেই বুঝতে পারত পটলডাঙার প্যাঁচ কাকে বলে। আবার যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়–

কিন্তু সত্যিই যে দেখা হবে সেকথা কে জানত! আর আমি, পটলডাঙার প্যালারাম, অন্তত সে-দেখা না হলেই খুশি হতুম।

ট্রেন একটু পরেই রামগড়ে পৌঁছল।

ক্যাবলার মেসোমশাই বলে দিয়েছিলেন গোরুর গাড়ি চাপতে, কিন্তু কলকাতার ছেলে হয়ে আমরা গোরুর গাড়িতে চাপব! ছোছোঃ!

টেনিদা বললে, ছ-মাইল তো রাস্তা! চল—হেঁটেই মেরে দিই—

আমি বললুম, সে তো বটেই—সে তো বটেই! দিব্যি পাখির গান আর বনের ছায়া—

ক্যাবলা বললে, ফুলের গন্ধ আর দক্ষিণের বাতাস—

টেনিদা বললে, আর পথের ধারে পাকা পাকা আম আর কাঁঠাল ঝুলছে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের মালিক ঠ্যাঙা নিয়া তাইড়া আসছে-

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ইস, দিলে সব মাটি করে! হচ্ছিল আম কাঁঠালের কথা, মেজাজটা বেশ জমে এসেছিল—কোথেকে আবার ঠ্যাঙা-ফ্যাঙা এসে হাজির করলে। এইজন্যেই তোদের মতো বেরসিকের সঙ্গে আসতে ইচ্ছে করে না। নে, এখন পা চালা—

সুটকেস কাঁধে, বিছানা ঘাড়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। কিন্তু বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়ানো আর সুটকেস বিছানা নিয়ে ছ-মাইল রাস্তা পাড়ি দেওয়া যে এক কথা নয় সেটা বুঝতে বেশি দেরি হল না। আধ মাইল হাঁটতে না-হাঁটতে আমার পালাজ্বরের পিলেটন-টন করে উঠল।

—টেনিদা, একটু জিরিয়ে নিলে হয় না?

টেনিদা তৎক্ষণাৎ রাজি।

–তা মন্দ বলিসনি। খিদেটাও বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে। একটু জল-টল খেয়ে নিলে হয়-কী বলিস ক্যাবলা? বলে টেনিদা ক্যাবলার সুটকেসের দিকে তাকাল। এর আগেই দেখে নিয়েছে, ক্যাবলার সুটকেসে নতুন বিস্কুটের টিন রয়েছে একটা।

ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গেই সুটকেসটাকে বগলে চেপে ধরল।

–জল-টল খাবে মানে? এক্ষুনি তো রামগড় স্টেশনে গোটা-আষ্টেক সিঙ্গাড়া খেয়ে এলে।

–তা খেয়েছি তো কী হয়েছে!–একটানে ক্যাবলার বগল থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে টেনিদা : ওই খেয়েই ছ-মাইল রাস্তা চলবে নাকি। আমার বাবা খিদেটা একটু বেশি–সে তোমরা যাই বলো!

বলেই ধপ করে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই খুলে ফেলল সুটকেস। চাবি ছিল না–পত্রপাঠ বেরিয়ে এল টিনটা।

একরাশ খাস্তা ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট। কী করি, আমরাও বসে পড়লুম। টেনিদা একাই প্রায় সবকটা সাবাড় করলে–আমরা ছিটে-ফোঁটার বেশি পেলুম না। শুধু ক্যাবলাই কিছু খেল না, হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রইল।।

ছ-মাইল রাস্তা–সোজা কথা নয়। হাবুল সেন দুখানা পাউরুটি রেখেছিল, এর পরে সেগুলোও গেল। কিন্তু টেনিদার খিদে আর মেটে না। রাস্তায় চিড়েমুড়ির দোকান দেখলেই বসে পড়ে আর হাঁক ছাড়ে : দুআনা পয়সা বের কর, প্যালা–খিদেয় পেটটা ঝিমঝিম করছে!

মাইল-চারেক পেরুতেই পাহাড়ি পথ আরম্ভ হল। দুধারে শালের জঙ্গল, আর তার ভেতর দিয়ে রাঙামাটির পথ ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। খানিকটা হাঁটতেই গা ছমছম করতে লাগল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ক্যাবলা বলে বসল : টেনিদা—এ-সব জঙ্গলে বাঘ থাকে।

টেনিদার মুখ শুকিয়ে গেল, বললে, যাঃ—যাঃ—

হাবুল বললে, শুনছি ভালুকও থাকে।

টেনিদা বললে, হুম্!

বাঘ ভালুকের পরে আর কী আছে আমার মনে পড়ল না। আমি বললাম, বোধহয় হিপোপোটেমাসও থাকে।

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে উঠল : থাম থাম প্যালা, বেশি পাকামো করিসনি। আমাকে ছাগল পেয়েছিস, না? হিপোপোটেমাস তো জলহস্তী। জঙ্গলে থাকে কী করে?

আমি বললুম, আচ্ছা যদি ভূত থাকে?

টেনিদা রেগে বললে, তুই একটা গো-ভূত! ভূত এখানে কেন থাকবে শুনি? মানুষই নেই, চাপবে কার ঘাড়ে?

ক্যাবলা ফস করে বলে বসল : যদি আমাদের ঘাড়েই চাপতে আসে? আর তুমি তো আমাদের লিডার—যদি তোমার ঘাড়টাই ভূতের বেশ পছন্দ হয়ে যায়?

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁ করে ডান হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিলে ক্যাবলার কান পাকড়ে ধরার জন্যে। তৎক্ষণাৎ পট করে সরে গেল ক্যাবলা, আর টেনিদা খানিকটা গোবরে পা দিয়ে একেবারে গজেশ্বরের মতো–

ধপাস-ধাঁই!

আনন্দে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ঠিক তৎক্ষণাৎ–

জঙ্গলের মধ্য থেকে হঠাৎ প্রায় ছহাত লম্বা একটা মূর্তি বেরিয়ে এল। প্যাঁকাটির মতো রোগা—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কটকটে কালো গায়ের রঙ। বিকট মুখে তার উৎকট হাসি। ভূতের নাম করতে করতেই জঙ্গল থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে।

বাবা গো বলে আমিই প্রথম উর্বশ্বাসে ছুট লাগালুম। ক্যাবলা এক লাফে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল, টেনিদা উঠতে গিয়ে আবার গোবরের মধ্যে আছাড় খেল, আর হাবুল সেন দু-হাতে চোখ চেপে ধরে চ্যাঁচাতে লাগল : ভূত—ভূত-রাম—রাম-

সেই মূর্তিটা বাজখাঁই গলায় হা-হা করে হেসে উঠল।

—খোঁকাবাবু আপনারা মিছাই ভয় পাচ্ছেন! হামি হচ্ছি ঝর্ণিপাহাড়ির ঝণ্টুরামবাবুর চিঠি পেয়ে আপনাদের আগ বাড়িয়ে নিতে এলাম। ভয় পাবেন না—ভয় পাবেন না—

আমি তখন আধ মাইল রাস্তা পার হয়ে গেছি ক্যাবলা গাছের মগডালে। হাবুল সমানে বলে চলেছে : ভূত আমার পুত, শাকচুন্নি আমার ঝি! টেনিদা তখনও গোবরের মধ্যেই ঠায় বসে আছে। ভিরমিই গেছে কি না কে জানে।

মূর্তিটা আবার বললে, কুছ ডর নেই খোঁকাবাবু, কুছ ডর নেই। আমি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরাম—আপনাদের নোকর—

চলমান জুতো

কী যে বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা! ভূত নয়—তবু কেমন ভূতের ভয় ধরিয়ে দিলে হতচ্ছাড়া ঝণ্টুরাম! আধ ঘণ্টা ধরে বুকের কাঁপুনি আর থামতেই চায় না!গোবর-টোবর মেখে টেনিদা উঠে দাঁড়াল। গোটাকয়েক অ্যাঁয়সা অ্যাঁয়সা কাঠ-পিঁপড়ের কামড় খেয়ে প্রাণপণে পা চুলকোতে চুলকোতে নামল ক্যাবলা। হাবুলের হাঁটু দুটো

থেকে-থেকে ধাক্কা খেতে লাগল। আর মাইলখানেক বাঁই বাঁই করে দৌড়োনোর ফলে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা পেট খুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল।

টেনিদাই সামলে নিলে সক্কলের আগে।

–ঝণ্টুরাম? দাঁত খিচিয়ে টেনিদা বললে, তা অমন ভূতের মতো চেহারা কেন?

-কী করব খোঁকাবাবু, ভগবান বানিয়েছেন।

–ভগবান বানিয়েছেন–ছোঃ!–টেনিদা ভেংচি কাটাল : ভগবানের আর খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না! ভগবানের হাতের কাজ এত বাজে নয়–তোকে ভূতে বানিয়েছে, বুঝলি?

–হাঃ!-ঝণ্টুরাম আপত্তিও করলে না।।

এবার ক্যাবলা এগিয়ে এল : তা, এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসেছিলি কেন? ঝণ্টুরাম কতকগুলো এলোমেলো দাঁত বের করে বললে, কী করব দাদাবাবু-ইস্টিশনে তো যাচ্ছিলাম। তা, পথের মধ্যে ভারি নিদ এসে গেল, ভাবলম একটু ঘুমিয়ে নিই। অ ঘুমাচ্ছি তো ঘুমাচ্ছি, শেষে নাকের ভেতরে দু-তিনটে মচ্ছর (মশা) ঘুসে গেল। উঠে দেখি, আপনারা আসছেন। আমি আপনাদের কাছে এলম তো আপনারা ডর খেয়ে অ্যাঁয়সা কারবার করলেন–

বলেই, খ্যাঁক-খ্যাঁক খিকখিক করে লোকটা ভুতুড়ে হাসি হাসতে আরম্ভ করে দিলে।

ক্যাবলা বললে, খুব হয়েছে, আর হাসতে হবে না! দাঁত তো নয়–যেন মুলোর দোকান খুলে বসেছে মুখের ভেতর! চল–চল এখন শিগগির, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল ঝন্টিপাহাড়িতে–

সত্যি, চমৎকার জায়গা এই ঝন্টিপাহাড়ি! নামটা যতই বিচ্ছিরি হোক—এখানে পা দিলেই গা যেন জুড়িয়ে যায়। তিনদিকে পাহাড়ের গায়ে শাল-পলাশের বনপলাশ ফুল ফুটে তাতে যেন লাল আগুন জ্বলছে। নানারকমের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে কত যে রঙের বাহার তাদের গায়ে! সামনে একটা ঝিল—তার নীল জল টলমল করছে দুটো-চারটে কলমিলতা কাঁপছে, তার ওপর আবার থেকে-থেকে কেউটে সাপের ফণার মতো গলা-তোলা পানকৌড়ি টপাটপ করে ডুব দিচ্ছে তার ভেতরে।

ঝিলের কাছেই একটা টিলার ওপর তিনদিকে বনের মাঝখানে মেসোমশায়ের বাংলো। লাল ইটের গাঁথুনি-সবুজ দরজা জানালালাল টালির চাল। হঠাৎ মনে হয় এখানেও যেন একরাশ পলাশ ফুল জড়ো হয়ে রয়েছে আর দুটো-চারটে সবুজ পাতা উঁকি দিচ্ছে তাদের ভেতরে।

এমন সুন্দর জায়গা—এমন মিষ্টি হাওয়া—এমন ছবির মতো বাড়ি—এখানে ভূতের ভয়! রাম রাম! হতেই পারে না!

বাংলোর ঘরগুলোও চমত্তার সাজানো। টেবিল, চেয়ার, ডেক-চেয়ার, আয়না, আলনাকত কী? খাটো মোটা জাজিম। আমরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝণ্টুরাম দুখানা ঘরের চারখানা খাটে চমৎকার করে বিছানা পেতে দিলে। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে আমরা আরাম করে বসলুম। ঝণ্টুরাম ডিমের ওমলেট আর চা এনে দিলে। তারপর জানতে চাইল : খোকাবাবুরা কী খাবেন দুপুরে? মাছ, না মুরগি?

-মুরগি-মুরগি!—আমরা কোরাসে চিৎকার করে উঠলাম।

টেনিদা একবার উস করে জিভের জল টানল : আর হ্যাঁচটপট পাকিয়ে ফেলোবুঝলে? এখন বেলা বারোটা বাজে—পেটে ব্রহ্মা খাই-খাই করছেন। আর বেশি দেরি হলে চেয়ার-টেবিলই খেতে আরম্ভ করব বলে দিচ্ছি!

–হঃ, তুমি তা পারবা। হাবুল সেন ঠুকে দিলে।

–কী কী বললি হাবুল?

–না না–আমি কিছু কই নাই।–হাবুল সামলে দিলে, কইতেছিলাম ঝণ্টু খুব তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারবে।

ঝণ্টুরাম চলে গেল। টেনিদা বললে, চেহারাটা যাচ্ছেতাই হলে কী হয় ঝণ্টুরাম লোকটা খুব ভালোনা রে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, যত্ন-আত্তি আছে। রোজ যদি মুরগি-টুরগি খাওয়ায় সাতদিনে আমরা লাল হয়ে উঠব।

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, আর লাল হয়ে কাজ নেই তোর! পালা-জ্বরে ভুগিস, বাসক পাতার রস দিয়ে কবরেজি বড়ি খাস, তোর এসব বেশি সইবে না। কাল থেকে তোর জন্যে কাঁচকলা আর গাঁদালের ঝোল বরাদ্দ করে দেব। বিদেশে-বিভুঁয়ে এসে যদি পটাৎ করে পটল তুলি, তাহলে সে ম্যাও সামলাবে কে–শুনি?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না! গাঁদালের ঝোল খেতে বয়ে গেছে আমার! মরি তো মুরগি খেয়েই মরব!

–আর পরজন্মে মুরগি হয়ে জন্মাবি। ডাকবি, কঁকঁ–কোঁকোর–কোঁ ইস্টুপিড ক্যাবলাটা বদসিকতা করলে। আমি বেদম চটে বসে বসে নাক চুলকোতে লাগলাম।

খেতে খেতে দুটো বাজল। আহা, ঝণ্টুর রান্না তো নয়–যেন অমৃত! পেটে পড়তে পড়তেই যেন ঘুম জড়িয়ে এল চোখে। রাত্রে ট্রেনের ধকলও লেগেছিল কম নয়নরম বিছানায় এসে গা ঢালতেই আমাদের মাঝ রাত্তির।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বিকেলের চা নিয়ে এসে ঝণ্টুরাম যখন আমাদের ডেকে তুলল, পাহাড়ের ওপারে তখন সূর্য ডুবে গেছে। শাল-পলাশের বন কালো হয়ে এসেছে, শিসের মতো রঙ ধরেছে ঝিলের জলে। দুপুরবেলা চারিদিকের যে মন-মাতানো রূপ চোখ ভুলিয়েছিল, এখন তা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। ঝাঁ ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠেছে ঝোপঝাড় আর বাংলোর পেছনের বন থেকে।

প্ল্যান ছিল ঝিলের ধারে বিকেলে মন খুলে বেড়ানো যাবে, কিন্তু এখন যেন কেমন ছম-ছম করে উঠল শরীর। মনে পড়ে গেল, কলকাতার পথে পথে-বাড়িতে বাড়িতে এখন ঝলমলে আলো জ্বলে উঠেছে, ভিড় জমেছে সিনেমার সামনে। আর এখানে জমেছে কালো রাতক্রমাগত বেড়ে চলেছে ঝিঁঝির চিৎকার, একটা চাপা আতঙ্কের মতো কী যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে আশেপাশে।

বারান্দায় বসে আমরা গল্প করার চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু ঠিক জমতে চাইল না। ঝণ্টুরাম একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল সামনে, তাইতে চারিদিকের অন্ধকারটা কালো মনে হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত টেনিদা বললে, আয়, আমরা গান গাই।

ক্যাবলা বললে, সেটা মন্দ নয়। এসো-কোরাস ধরি।-বলেই চিৎকার করে আরম্ভ করলে–

আমরা ঘুচাব মা তোর কলিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ–

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিনজনে গলা জুড়ে দিলুম। সে কী গান!

আমাদের চারজনের গলাই সমান চাঁছাছোলা–টেনিদার তো কথাই নেই। একবার টেনিদা নাকি অ্যাঁয়সা কীর্তন ধরেছিল যে তার প্রথম কলি শুনেই চাটুজ্যেদের পোষা

কোকিলটা হার্টফেল করে। আমরা এমনই গান আরম্ভ করে দিলুম যে ঝণ্টুরাম পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছুটে এল।

আমরা সবাই বোধ হয় একটা কথাই ভাবছিলুম। ঝন্টিপাহাড়ের বাংলোতে যদি ভূত থাকে, তবুও এ-গান তাকে বেশিক্ষণ সইতে হবে না—আপনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে এখান থেকে।

কিন্তু সেই রাত্রে–

আমি আর ক্যাবলা এক ঘরে শুয়েছি—পাশের ঘরে হাবুল সেন আর টেনিদা। একটা লণ্ঠন আমাদের ঘরে মিটিমিট করছে ঘরের চেয়ার টেবিল আয়নাগুলো কেমন অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। ভয়টা আমার বুকের ভেতরে চেপে বসল। অনেকক্ষণ বিছানায় আমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলুম কান পেতে শুনলুম, টেনিদার নাকেসা রে গা মার সাতটা সুর বাজছে। কাচের জানালা দিয়ে দেখলুম বাইরে কালো পাহাড়ের মাথায় একরাশ জ্বলজ্বলে তারা। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি।

হঠাৎ খুট—খুট—খটা-খটাৎ-

চমকে জেগে উঠলাম। কে যেন হাঁটছে।

কোথায়?

এই ঘরের মধ্যেই। যেন পায়ে বুট পরে কে চলে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দিলুম। না—ঘরে তো কিছু নেই! তবু সেই জুতোর আওয়াজ। কেউ হাঁটছে—নির্ঘাত হাঁটছে! খুট-খুট—খটাত-খটাত–

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : ক্যাবলা!

ক্যাবলা লাফিয়ে উঠল : কী-কী হয়েছে?

-কে যেন হাঁটছে ঘরের ভেতর?

কী গোঁয়ার-গোবিন্দ এই পুঁচকে ক্যাবলা! তক্ষুনি তড়াক করে নেমে পড়ল মেঝেতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ইঁদুর দুড়দুড় করে দরজার চৌকাটের গর্ত দিয়ে বাইরে দৌড়ে পালাল।

ক্যাবলা হেসে উঠল।

-তুই কী ভিতু রে প্যালা! একটা পুরোনো ঘেঁড়া জুতোর মধ্যে ঢুকে ইঁদুরটা নড়ছিল—তাই এই আওয়াজ। এতেই এত ভয় পেলি!

শুনেই আমি বীরদর্পে বললুম—যাঃ—যাঃ—আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি নাকি!-বেশ ডাঁটের মাথায় বললুম, ইঁদুর তো ছার-সাক্ষাৎ ব্রহ্মদত্যি যদি আসে-

কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল আমার। সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে জেগে উঠল এক প্রচণ্ড অমানুষিক আর্তনাদ। সে-গলা মানুষের নয়। তারপরেই আর-একটা বিকট অট্টহাসি। সে-হাসির কোনও তুলনা হয় না। মনে হল, পাতালের অন্ধকার থেকে তা উঠে আসছে, আর তার শব্দে ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোটা থর-থর করে কেঁপে উঠছে!

রোমাঞ্চকর রাত

সে-ভয়ঙ্কর হাসির শব্দটা যখন থামল, তখনও মনে হতে লাগল ঝন্টিপাহাড়ির ডাকবাংলোটা ভয়ে একটানা কেঁপে চলেছে। আমি বিদ্যুৎবেগে আবার চাদরের তলায় ঢুকে পড়েছি, সাহসী ক্যাবলাও এক লাফে উঠে গেছে তার বিছানায়। আমার

হাত-পা হিম হয়ে এসেছে–দাঁতে-দাঁতে ঠকঠকানি শুরু হয়েছে। যতদূর বুঝতে পারছি, ক্যাবলার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

প্রায় দশ মিনিট।

তারপর ক্যাবলাই সাহস ফিরে পেল। শুকনো গলায় বললে, ব্যাপার কী রে প্যালা?

চাদরের তলা থেকেই আমি বললাম, ভু–ভূ-ভূত!

ক্যাবলা উঠে বসেছে। আমি চাদরের তলা থেকে মিটমিট করে ওকে দেখতে লাগলাম।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু কথা হল, ভূত এখানে খামকা হাসতে যাবে কেন?

ভুতুড়ে বাড়িতে ভূত হাসবে না তো হাসবে কোথায়? তারও তো হাসবার একটা জায়গা চাই। আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, তাই বলে মাঝরাতে অমন করে হাসতে যাবে কেন? লোকের ঘুম নষ্ট করে অমন বিটকেল আওয়াজ ঝাড়বার মানে কী?

আমি বললুম, ভূত তো মাঝরাতেই হাসে। নইলে কি দুপুরবেলা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বসে হাসবে নাকি?

ক্যাবলা বললে, তাই তো উচিত! তাহলে অন্তত ভূতের সঙ্গে একটা মোকাবিলা হয়ে যায়। তা নয়, সময় নেই অসময় নেই, যেন 'হাহা' শব্দরূপ আউড়ে গেল–হাহা-হাহৌ-হাহাঃ! আচ্ছা প্যালা, ভূতদের যখন-তখন এরকম যাচ্ছেতাই হাসি পায়। কেন বল দিকি?

আমি চটে গিয়ে বললুম, তার আমি কী জানি! তোর ইচ্ছে হয় ভূতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না।

ক্যাবলা আবার চুপ করে নেমে পড়ল খাট থেকে। বললে, তাই চল না প্যালা–ভূতের চেহারাটা একবার দেখেই আসিগে! সেইসঙ্গে একথাও বলে আসি যে আপাতত এবাড়িতে চারটি ভদ্রলোকের ছেলে এসে আস্তানা নিয়েছে। এখন রাত দুপুরে ওরকম বিটকেল হাসি হেসে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত করা নিতান্ত অন্যায়।

বলে কী ক্যাবলা! আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

-খেপেছিস নাকি তুই?

–খেপব কেন? বুকের পাটা আছে বটে ক্যাবলার! একটুখানি হেসে বললে, আমার কী মনে হয় জানিস? ভূতও মানুষকে ভয় পায়।

কী বকছিস যা-তা?

–ভয় পায় না তো কী! নইলে কলকাতায় ভূত আসে না কেন? দিনের বেলায় তাদের ভুতুড়ে টিকির একটা চুলও দেখা যায় না কেন? বাইরে বসে বসে হাসে কেন? ঘরে ঢুকতে ভূতের সাহস নেই কেন?

আমি আঁতকে উঠে বললুম, রাম রাম! ওসব কথা মুখেও আনিসনি ক্যাবলা! হাসির নমুনাটা একবার শুনলি তো? এখুনি হয়তো দুটো কাটা মুণ্ডু ঘরে ঢুকে নাচতে শুরু করে দেবে!

ক্যাবলাটা কী ডেঞ্জারাস ছেলে! পটাং করে বলে ফেলল–তা নাচুক না। কাটা মুণ্ডুর নাচ আমি কখনও দেখিনি, বেশ মজা লাগবে! আচ্ছা–আমি ওয়ান-টু-থ্রি বলছি। ভূতের যদি সাহস থাকে, তাহলে থ্রি বলবার মধ্যেই এই ঘরে ঢুকে নাচতে আরম্ভ করবে। আই চ্যালেঞ্জ ভূত! ওয়ান-টু-

কী সর্বনাশ? করছে কী ক্যাবলা! ভূতের সঙ্গে চালাকি। ওরা যে পেটের কথা শুনতে পায়! ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে আমি চাদরের তলায় মুখ লুকোলুম। এবার এল–নির্ঘাত–এল–

ক্যাবলা বললে, থ্রি!

চাদরের তলায় আমি পাথর হয়ে পড়ে আছি। একেবারে নট-নড়নচড়ন ঠকাস মার্বেল। এক্ষুনি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে! এলএল–ওই এসে পড়ল

কিন্তু কিছুই হল না। ভূতেরা ক্যাবলার মতো নাবালককে গ্রাহ্যই করল না বোধহয়।

ক্যাবলা বললে, দেখলি তো! চ্যালেঞ্জ করলুম–তবু আসতে সাহস পেল না। চল–এক কাজ করি। টেনিদা আর হাবুল সেনও নিশ্চয়ই জেগেছে এতক্ষণে। আমরা চারজনে মিলে ভূতেদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ভয়ে আমার দম আটকে গেল।

-ক্যাবলা, তুই নির্ঘাত মারা যাবি? ক্যাবলা কর্ণপাত করল না। সোজা এসে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলে।

–ওঠ–

আমি প্রাণপণে চাদর টেনে বিছানা আঁকড়ে রইলুম!

–কী পাগলামি হচ্ছে ক্যাবলা! যা, শুয়ে পড়–

ক্যাবলা নাছোড়বান্দা। ওর ঘাড়ে ভূতই চেপে বসেছে না কি কে জানে! আমাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বললে, ওঠ বলছি! ভূতে মাঝরাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে আর আমরা চুপটি করে সয়ে যাব! সে হতেই পারে না। ওঠ ওঠ-শিগগির

এমন করে টানতে লাগল যে চাদর-বিছানাসুদ্ধু আমাকে ধপাস্ করে মেঝেতে ফেলে দিলে।

এই ক্যাবলা, কী হচ্ছে?

ক্যাবলা কোনও কথা শোনবার পাত্রই নয়। টেনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। বললে, চল দেখি, পাশের ঘরে টেনিদা আর হাবুল কী করছে!

বলে লণ্ঠনটা তুলে নিলে।।

অগত্যা রাম রাম দুর্গা-দুগা বলে আমি ক্যাবলার সঙ্গেই চললুম। ও যদি লণ্ঠন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে এক সেকেন্ডও আর আমি ঘরে থাকতে পারব না! দাঁতে দাঁতে লেগে যাবে, অজ্ঞান হয়ে যাব—হয়তো মরেও যেতে পারি। এমনিতেও তো আমার পালাজ্বরের পিলেটা থেকে-থেকে কেমন গুরগুরিয়ে উঠছে।

পাশের দরজাটা খোলাই ছিল। ওদের ঘরে ঢুকেই ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল : এ কী, ওরা। গেল কোথায়?

তাই তো কেউ নেই! দুটো বিছানাই খালি! না টেনিদানা হাবুল। অথচ দুটো ঘরের মাঝের দরজা ছাড়া আর সমস্ত জানালা-দরজাই বন্ধ। আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া। ওদের তো আর বেরুবার পথ নেই।

ক্যাবলা বললে, গেল কোথায় বল দিকি!

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, নির্ঘাত ভূতে ভ্যানিশ করে দিয়েছে! এতক্ষণে ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে ফেলেছে ওদের!

এতক্ষণে বোধহয় ক্যাবলার খটকা লেগে গিয়েছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, তাই তো রে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব! দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!

আর ঠিক তক্ষুনি—

ক্যাঁক ক্যাঁক করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। যেন ঘরের মধ্যে সাপে ব্যাঙ ধরেছে কোথাও। ক্যাবলা চমকে একটা লাফ মারল, একটুর জন্যে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল হাতের লণ্ঠনটা। আর আমিও তিড়িং করে একেবারে টেনিদার বিছানায় চড়ে বসলুম।

আবার সেই ক্যাঁক ক্যাঁক-কোঁক!

নির্ঘাত ভূতের আওয়াজ! আমার পালাজ্বরের পিলেতে প্রায় ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবছি এবার একটা যাচ্ছেতাই ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে যাবে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে ক্যাবলা হা-হা করে হেসে উঠল।

চমকে তাকিয়ে দেখি, লণ্ঠনটা নিয়ে হাবুলের খাটের তলায় ঝুঁকে রয়েছে ক্যাবলা। তেমনি বেয়াড়াভাবে হাসতে হাসতে বললে, দ্যাখ প্যালা আমাদের লিডার টেনিদা আর হাবুলের কাণ্ড! ভূতের ভয়ে এ-ওকে জাপটে ধরে খাটের তলায় বসে আছে!

বলেই ক্যাবলা দস্তুরমতো অট্টহাসি করতে শুরু করলে।

খাটের তলা থেকে টেনিদা আর হাবুল গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল। দুজনেরই নাকে-মুখে ধুলো আর মাকড়সার ঝুল। টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর হাবুল সেনের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে প্রায় আকাশে চড়ে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, এই বীরত্ব তোমার। তুমি আমাদের দলপতি—আমাদের পটলডাঙার হিরো—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন–

টেনিদা তখন সামলে নিয়েছে। নাক থেকে ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, থাম থাম, মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি! আমরা খাটের তলায় ঢুকেছিলুম একটা মতলব নিয়ে।

হাবুলের কাঁধের ওপর একটা আরশোলা হাঁটছিল। হাবুল টোকা মেরে সেটাকে দূরে ছিটকে দিয়ে বলল, হহ, আমাগো একটা মতলব আছিল!

ক্যাবলা বললে, শুনি না—কেয়া মতলব সেটা! বাতলাও। ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, কথায় কথায় ওর রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে পড়ে দুএকটা।

টেনিদা তখন সাহস পেয়ে জুত করে বিছানার ওপর উঠে বসেছে। বেশ ডাঁটের মাথায় বললে, বুঝলি না? আমরা খাটের তলায় বসে ওয়াচ করছিলুম। যদি একটা ভূত-টুত ঘরের মধ্যে ঢোকে–

হাবুল টেনিদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, তখন দুইজনে মিল্যা ভূতের পা ধইরা একটা হ্যাঁচকা টান মারুম—আর ভূতে–

টেনিদা বললে, একদম ফ্ল্যাট! ক্যাবলা খিকখিক করে হাসতে লাগল।

টেনিদা চটে গিয়ে বললে, অমন করে হাসছিস যে ক্যাবলা? জানিস ওতে আমার ইনসাল্ট হচ্ছে? টেক কেয়ার! গুরুজনকে যদি অমন করে তুরু করবি, তা হলে চটে গিয়ে এমন একখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব

টেনিদা বোধহয় ক্যাবলার নাকে একটা মুগ্ধবোধ বসাবার কথাই ভাবছিল, সেই সময় আবার একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটল।

পাশের জানালাটার কাচে ঝনঝন করে শব্দ হল একটা। কতকগুলো ভাঙা কাচ ছিটকে পড়ল চারিদিকে আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে শাদা বলের মতো কী একটা ঠিকরে পড়ল এসে—একেবারে ক্যাবলার পায়ের কাছে গড়িয়ে এল।

আর লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখলুম-ওটা আর কিছু নয়, স্রেফ মড়ার মাথার খুলি।

—ওরে দাদা।

আমি মেঝেতে ফ্ল্যাট হলুম সঙ্গে সঙ্গেই। হাবুল আর টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আবার খাটের তলায় অদৃশ্য হল। শুধু লণ্ঠন হাতে করে ক্যাবলা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—শুয়ে পড়ল না, বসেও পড়ল না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পৈশাচিক অট্টহাসি উঠল। সেই হাসির সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে লাগল ঝন্টিপাহাড়ির ডাকবাংলো।

কে তুমি হাস্যময়?

বাকি রাতটা যে আমাদের কী ভাবে কাটল, সে আর খুলে না বললেও চলে।

টেনিদা আর হাবুল সেনের কী হল জানি না আমি তো প্রায় অজ্ঞান। তার মধ্যেই মনে। হচ্ছিল, দুটো তালগাছের মতো পেল্লায় ভূত আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। একজন যেন বলছে : এটাকে কালিয়া রান্না করে খাব, আর-একজন বলছে : দুরদুর! এটা একেবারে শুটকো চামচিকের মতো গায়ে একরত্তি মাংস নেই। বরং এটাকে তেজপাতার মতো ডাল সম্বরা দেওয়া যেতে পারে।

আমি বোধহয় ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিলুম, হঠাৎ তিড়িক করে লাফিয়ে উঠতে হল। মুখের ওপর কে যেন আঁজলা-আঁজলা করে জল দিচ্ছে। আর, কী ঠাণ্ডা সে জল! বাঘের নাকে সে জল ছিটিয়ে দিলে বাঘ-সুদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

বাঘ অজ্ঞান হোক কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে এল, মানে, আসতেই হল তাকে।

আর কে? ক্যাবলা। করেছে কী-বাগানে জল দেবার একটা ঝাঁঝরি নিয়ে এসেছে, তাই দিয়ে আমাকে স্রেফ চান করিয়ে দিচ্ছে।

–ওরে থাম থাম–

ক্যাবলা কি থামে! আমার মুখের ওপর আবার একরাশ জল ছিটিয়ে দিয়ে বললে, কী রে, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

ঠাণ্ডা মানে? সারা গা ঠাণ্ডা হবার জো হল–আমি তড়াক করে ঝাঁঝরির আক্রমণ থেকে পাশ কাটালুম।

কাচের জানালা দিয়ে বাইরের ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। ঝন্টিপাহাড়ির ডাকবাংলোয় একটা দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়ে গেছে। সামনে লেকের নীল জলটার ওপর ভোরের লালচে রং। পাখির মিষ্টি ডাক শুরু হয়েছে চারদিকে শিশিরে ভেজা শাল-পলাশের বন যেন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছতে মুছতে আমার মনে হল, এমন সুন্দর জায়গায় এমন বিচ্ছিরি ভূতের ব্যাপার না থাকলে দুনিয়ায় কার কী ক্ষতি হত।

আমি তো এসব ভাবছি, ওদিকে ক্যাবলার ঝাঁঝরি সমানে কাজ করে চলেছে। খানিক পরে হাঁই-মাই কাঁই-কাঁই আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, ঝাঁঝরির আক্রমণে জর্জরিত হয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে টেনিদা আর হাবুল।

ক্যাবলা হেসে বললে, তোমাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে কেমন দাওয়াইটি বের করেছি! দেখলে তো!

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, থাক, বকিসনি। আমরা অজ্ঞান হয়েছিলাম কে বললে তোকে? দুজনে চুপি-চুপি প্ল্যান আঁটছিলুম, আর তুই রাস্কেল ঠাণ্ডা জল দিয়ে–

বলেই টেনিদা ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে। বললে, ইঃ গেছি–গেছি! এই শীতের সকালে যেভাবে নাইয়ে দিয়েছিস, তাতে এখন ডবল-নিউমোনিয়া না হলে বাঁচি!

ঝণ্টুরামকে জিজ্ঞেস করে কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

সে ডাকবাংলোয় থাকে না। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে তার বাড়ি। আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সকালবেলায় এসেছে।

টেনিদা বললে, ওটা কোনও কম্মের নয়–একেবারে গাড়ল! হাবুল সেন মাথা চুলকে বললে, ও নিজেই ভূত কি না সেই কথাটাই বা কেডা কইব? চেহারাখানা দেখতে আছ না? য্যান তালগাছের থন নাইম্যা আসছে।

আমি আঁতকে উঠলাম : সত্যিই কি ভূত নাকি?

টেনিদা বললে, তোরা দুটোই হচ্ছিস্ গোর্ভূত! জানিনে, ভূত আগুন দেখলেই পালায়? ও ব্যাটা নিজে উনুন ধরিয়ে চা করে দিলে, রাত্তিরে ওর রান্না মুরগির ঝোল আর ভাত দু-হাতে সাঁটলি, সেকথা মনে নেই বুঝি?

আমরা আর সাঁটতে পেরেছি কইমুরগির দু-এক টুকরো হাড় কেবল চুষতে পেরেছি, বাকি সবটাই টেনিদার পেটে গেছে। কিন্তু এখন আর সে কথা বলে কী হবে!

আমি বললুম, ঝণ্টুরাম ভূত হোক আর না-ই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সোজা কথা হচ্ছে, পটল যদি তুলতেই হয়, তাহলে পটলডাঙাতে গিয়েই তুলব। এখানে ভূতের হাতে মরতে আমি রাজি নই। আমি আজকেই কলকাতায় ফিরে যাব।

হাবুল উৎসাহিত হয়ে বললে, হ-হ, আমিও সেই কথাই কইতে আছিলাম।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটা চুলকোতে লাগল।

আমি বললুম, তোমাদের ইচ্ছে হয় থাক। ভূতেরা ধরে ধরে তোমাদের হাঁড়ি কাবাব করে খাককাটলেট বানাক, রোস্ট করে ফেলুক—আমার কিছুই আপত্তি নেই।

আজই আমি পালাব।

টেনিদা বললে, তাই তো! কিন্তু জায়গাটা খাসা—বেশ প্রেমসে খাওয়া-দাওয়াও করা যাচ্ছিল, কিন্তু ভূতগুলোই সব মাটি করে দিলে!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, সইত্য কথা। এখানে জঙ্গলের মধ্যে থাইক্যা ভূতগুলানে কী যে সুখ হয়—তাও তো বুঝি না। আমাগো কইলকাতায় গিয়া বাসা করত, থাকতও ভালো, আমরাও ছুটি পাইতাম। আর যদি বাইছা বাইছ্যা হেড পণ্ডিতের ঘাড়ে উইঠ্যা বসত, তাহলে আমাগো আর শব্দরূপ মুখস্থ করতে হইত না!

—সে তো বেশ ভালো কথা, কিন্তু ভূতগুলোকে সেকথা বোঝায় কে! টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : যেতে চাস তো চল্। কিন্তু সত্যি, ভারি মায়া লাগছে রে! এমন আরাম, এমন খাওয়া-দাওয়া, ঝন্টেটা আবার রুটির সঙ্গে কতটা করে মাখন দিয়েছিল—দেখেছিস তো? এখানে দিনকয়েক থাকলে আমরা লাল হয়ে যেতুম।

আমি বললাম, তার আগে ভূতেরাই লাল হয়ে যাবে।

টেনিদা সামনে থেকে একটা প্লেট তুলে নিয়ে তার তলায় লেগে থাকা একটুখানি মাখন চট করে চেটে নিলে। তারপরের আর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

তা হলে আজই? আমি আর হাবুল সমস্বরে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ক্যাবলার কথা এতক্ষণ আমাদের মনেই ছিল না। সেই যে ভোরবেলা ঝাঁঝরি-দাওয়াই দিয়ে আমাদের জ্ঞান ফিরিয়েছে, তারপর আর তার পাত্তা নেই। কোথায় গেল ক্যাবলা?

আমি বললাম, ক্যাবলা গেল কোথায়?

টেনিদা চমকে বললে, তাই তো! সকাল থেকে তো ক্যাবলাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

হাবুল সেন জানতে চাইল; ভূতের সঙ্গে মস্করা করতে আছিল, ভূতে তারে লইয়া যায় নাই তো?

টেনিদা মুখ-টুক কুঁচকে বললে, বয়ে গেছে ভূতের! ওটা যা অখাদ্যি—ওকে ভূতেও হজম করতে পারবে না। কিন্তু গেল কোথায়? আমাদের ফেলেই চম্পট দিলে না তো?

ঠিক এই সময় হঠাৎ বাজখাঁই গলায় গান উঠল :

ছপ্পর পর কৌয়া নাচে, নাচে বগুলা—
আরে রামা হো-হো রামা—

গানটা এমন বেখাপ্পা যে আমি চেয়ারসুদ্ধ উটে পড়তে পড়তে সামলে গেলুম। এ আবার কী রে বাবা! দিন-দুপুরে এসে হানা দিলে নাকি! কিন্তু ভূতে রাম নাম করতে যাবে কোন্ দুঃখে?

ভূত নয়—ক্যাবলা। কোত্থেকে একগাল হাসি নিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল।

গিয়েছিলি কোথায়? অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিসই বা কেন?—টেনিদা জানতে চাইলে।

বলছি ক্যাবলা করুণ চোখে সামনের পেয়ালা-পিরিচগুলোর দিকে তাকাল : এর মধ্যেই ব্রেকফাস্ট শেষ? আমার জন্যেই কিছু ই বুঝি?

–সে আমরা জানিনে, ঝণ্টুরাম বলতে পারে -টেনিদা বললে, ব্রেকফাস্ট পরে করবি, কোথায় গিয়েছিলি তাই বল।

ক্যাবলা মিটমিট করে হেসে বলল, ভূতের খোঁজে গিয়েছিলুম। ভূত পাওয়া গেল না পাওয়া গেল একঠোঙা চীনেবাদাম।

চীনেবাদাম!

ক্যাবলা বললে, তাতে অর্ধেক খোসা, অর্ধেক বাদাম। মানে অর্ধেকটা খাওয়ার পরে আর সময় পায়নি।

–কে সময় পায়নি? –আমি বেকুবের মতো জিজ্ঞেস করলুম।

জানালার ও ধারে ঝোপের ভেতরে বসে যারা মড়ার মাথা ছুঁড়েছিল, তারাই। যদি ভূতও হয়–তাহলে কিন্তু বেশ মডার্ন ভূত, টেনিদা! মানে বাদাম খায়, মুড়ি খায়, তেলেভাজাও খায়। তেলেভাজার শালপাতা আর মুড়িও পাওয়া গেল কিনা!

টেনিদা বললে, তার মানে–

ক্যাবলা বললে, তার মানে হল, এ সব কোনও বদমাস আদমি কা কারসাজি! তারাই। রাত্তিরে অমনি করে যাচ্ছেতাই রকম হেসেছে, ঘরের ভেতরে মড়ার মাথা ফেলেছে–অর্থাৎ আমাদের তাড়ানোর মতলব। তুমি পটলডাঙার টেনিদা–গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন–তুমি এসব বদমায়েসদের ভয়ে পালাবে এখান থেকে।

–ঠিক জানিস? ভূত নয়?

–ঠিক জানি।-ক্যাবলা বললে, ভূতে তেলেভাজা আর চীনেবাদাম খায়, একথা কে কবে শুনেছে? তার ওপর তারা বিড়িও খেয়েছে। দু-চারটে পোড়া বিড়ির টুকরোও ছিল।

–তা হলে বদমাস লোক!–পটলডাঙার টেনিদা হঠাৎ বুক ঠুকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল; মানুষ যদি হয়, তবে বাবাজীদের এবার ঘুঘু আর ফাঁদ দুই-ই দেখিয়ে ছাড়ব! চলে আয় সব–কুইক মার্চ–

বলে এমনিভাবে আমাকে একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে আমি ছিটকে সামনের মেঝেয় গিয়ে পড়লুম।

হাবুল সেন প্যাঁচার মতো ব্যাজার মুখে বললে, কোথায় যেতে হবে?

–লোকগুলোর সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে। আমরা কলকাতার ছেলে আমাদের বক দেখিয়ে কেটে পড়বে ইয়ার্কি নাকি! চল-চল, ভালো করে একবার চারদিকটা ঘুরে দেখি।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু আমার ব্রেকফাস্ট–

–সেটা একেবারে লাঞ্চের সময়েই হবে। নে–চলহাবুল আর ক্যাবলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল স্পষ্ট দিনের আলোয়–সেই বেলা আটটার সময়–ঠিক আমাদের মাথার ওপর কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল : বাঃ–বেশ, বেশ!

তারপরেই হা-হা করে ঠাট্টার অট্টহাসি!

কে বললে, কে হাসল? কেউ না। মাথার ওপরে টালির চাল আর লাল ইটের ফাঁকা দেওয়াল-জন-মানুষের চিহ্নও নেই কোথাও। যেন হাওয়ার মধ্যে থেকে ভেসে এসেছে। আশ্চর্য শব্দগুলো।

‘ছপ্পর পর কৌয়া নাচে’

রাত নয়—অন্ধকার নয়—একেবারে ফুটফুটে দিনের আলো। দেওয়ালের ওপরে টালির চাল—একটা চড়ুই পাখি পর্যন্ত বসে নেই সেখানে। অথচ ঠিক মনে হল ওই টালির চাল কুঁড়েই হাসির আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

কী করে হয়? কী করে এমন সম্ভব?

আমরা কি পাগল হয়ে গেছি? না কি ঝণ্টুরাম চায়ের সঙ্গে সিদ্ধি ফিদ্ধি কিছু খাইয়ে দিলে? তাই বা হবে কেমন করে? ক্যাবলা তো চা খায়নি আমাদের সঙ্গে! তবু সেও ওই

অশরীরী হাসির আওয়াজটা ঠিক শুনতে পেয়েছে।

প্রায় চার মিনিট ধরে আমরা চারমূর্তি চারটে লাটুর মতো বসে রইলুম। আমরা অবশ্য লাটুর মতো ঘুরছিলুম না—কিন্তু মগজের সব ঘিলুগুলো ঝনঝনর করে পাক খাচ্ছিল। খাসা ছিলুম পটলডাঙায়, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়ে দিব্যি দিন কাটছিল। কিন্তু টেনিদার প্যাঁচে পড়ে এই ঝন্টিপাহাড়ে এসে দেখছি ভুতের কিল খেয়েই প্রাণটা যাবে।

আরও তিন মিনিট পরে যখন আমার পিলের কাঁপুনি খানিক বন্ধ হল, আমি ক্যাবলাকে বললুম, এবার?

হাবুল সেন গোঁড়ালেবুর মতো চোখ দুটোকে একবার চালের দিকে বুলিয়ে এনে বললে, হ,

অখন কও!

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মতো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল। জিভ দিয়ে একবার মুখ-টুখ চেটে টেনিদা বললে, মানে—ইয়ে হল, মানুষটানুষ সামনে পেলে চাঁটির চোটে তার নাক-টাক উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু ইয়ে—মানে, ভূতের সঙ্গে তো ঠিক পারা যাবে না

আমি বললুম, তা ছাড়া ভূতেরা ঠিক বক্সিংয়ের নিয়ম-টিয়মও মানে না—

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, তুই থাম না পুঁটিমাছ!

পুঁটিমাছ বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। যদি ভূতের ভয় আমাকে বেজায় কাবু করে না ফেলত আর পালাজ্বরের পিলেটা টনটনিয়ে না উঠত, আমি ঠিক টেনিদাকে পোনামাছ নাম দিয়ে দিতুম।

ক্যাবলা কিন্তু ভাঙে তবু মচকায় না।

চট করে সে একেবারে সামনের লনে গিয়ে নামল। তারপর মাথা উঁচু করে সে দেখতে লাগল। তারও পরে বেজায় খুশি হয়ে বললে, ঠিক ধরেছি। ওই যে বলছিলুম না?

ছপ্পর পর কৌয়া নামে
নাচে বগুলা—

টেনিদা বলল—মানে?

ক্যাবলা বললে, মানে? মানে হল, চালের ওপর কাক নাচে—আর নাচে বক।

রাখ তোর বক নিয়ে বকবকানি। কী হয়েছে বল দিকি?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হবে আর কী। একেবারে ওয়াটারের মতো—মানে পানিকা মাফিক সোজা ব্যাপার। ওই চালের ওপরে লোক বসেছিল কেউ। সেই ওরকম বিটকেল হাসি হেসে আমাদের ভয় দেখিয়েছে।

—সে-লোক গেল কোথায়?

-আঃ, নেমে এসো না—দেখাচ্ছি সব। আরে ভয় কী হয় রাম রাম জপ করতে করতেই চলে এসো এখানে।

ভয়! ভয় আবার কে পেয়েছে? —টেনিদা শুকনো মুখে বললে, পায়ে ঝি ঝি ধরেছে কিনা—

ক্যাবলা খিকখিক করে হাসতে লাগল।

ভূতের ভয়ে বহুত আদমির অমন করে ঝি ঝি ধরে। ও আমি অনেক দেখেছি।

এর পরে বসে থাকলে আর দলপতির মান থাকে না। টেনিদা ডিম-ভাজার মতো মুখ করে আস্তে-আস্তে লনে নেমে গেল। অগত্যা আমি আর হাবুলও গুটিগুটি গেলাম টেনিদার পেছনে পেছনে।

ক্যাবলা বললে, পেছনে ওই ঝাঁকড়া পিপুল গাছটা দেখছ? আর দেখছ—ওর একটা মোটা ডাল কেমনভাবে বাংলোর চালের ওপর নেমে এসেছে? ওই ডাল ধরে একটা লোক চালের ওপর নেমে এসেছিল। টালিতে কান পেতে আমাদের কথাগুলো শুনেছে, আর হা-হা করে হেসে ভয় দেখিয়ে ডাল বেয়ে সটকে পড়েছে।

হাবুল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল; হ, এইটা নেহাত মন্দ কথা কয় নাই। দ্যাখতে আছ না, চালের উপর কতকগুলি কাঁচা পাতা পইড়া রইছে? কেউ ওই ডাল বাইয়া আসছিল ঠিকেই।

—আসছিল তো ঠিকেই হাবুলের গলা নকল করে টেনিদা বললে, কিন্তু এর মধ্যেই সে গেল কোথায়?

ক্যাবলা বললে, কোথাও কাছাকাছি ওদের একটা আড্ডা আছে নিশ্চয়। মুড়ি আর চীনেবাদাম দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। সেই আড্ডাটাই খুঁজে বের করতে হবে। রাজি আছ?

টেনিদা নাক চুলকে বললে, মানে কথা হল—

ক্যাবলা আবার খিকখিক করে হেসে উঠল : মানে কথা হল, তোমার সাহস নেই—এই তো? বেশ, তোমরা না যাও আমি একাই যাচ্ছি।

দলপতির মান রাখতে প্রায় প্রাণ নিয়ে টান পড়বার জো! টেনিদা শুকনো হাসি হেসে বললে, যাঃ—যা বাজে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি। মানে, সঙ্গে দু-একটা বন্দুক-পিস্তল যদি থাকত–

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, বন্দুক-পিস্তল থাকলেই বা কী হত। কখনও ছুঁড়েছি নাকি ওসব! আর টেনিদার হাতে বন্দুক থাকা মানেই আমরা স্রেফ খরচের খাতায়। ভূত-টুত মারবার আগে টেনিদা আমাদেরই শিকার করে বসত।

ক্যাবলা বলল, বন্দুক দিয়ে কী হবে? তুমি তো এক-এক চড়ে গড়ের মাঠের এক-একটা গোরাকে শুইয়ে দিয়েছে শুনতে পাই। বন্দুক তোমার মতো বীরপুরুষের কী দরকার?

অন্য সময় হলে টেনিদা খুশি হত, কিন্তু এখন ওর ডিম-ভাজার মতো মুখটা প্রায় আলুকাবলির মতো হয়ে গেল। টেনিদা হতাশ হয়ে বললে, আচ্ছাচল দেখি একবার!

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ক্যাবলা ভরসা দিয়ে বললে, তুমি কিছু ভেবো না টেনিদা। এ সব নিশ্চয় দুষ্টু লোকের কারসাজি। আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে এত ঘেবড়ে যাব? ওদের জারি-জুরি ভেঙে দিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব, এই বলে দিলাম।

হাবুল ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল :হ! কার জারিজুরি যে কেডা ভাঙব, সেইটাই ভালো বোঝা যাইতে আছে না!

কিন্তু ক্যারলা এর মধ্যেই বীরদর্পে পা বাড়িয়েছে। টেনিদা মানের দায়ে চলেছে পেছনে পেছনে। হাবুলও শেষ পর্যন্ত এগোল সুড়সুড় করে। আমি পালাজ্বরের রুগী প্যালারাম, আমার ওসব ধাষ্টামোর মধ্যে এগোনোর মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তবু একা-একা এই বাংলোয় বসে থাকব-ওরে বাবা! আবার যদি সেই ঘর-ফাটানো হাসি শুনতে পাই–তা হলে আমাকে আর দেখতে হবে না! বাংলোতে হতভাগা ঝণ্টুরামটা থাকলেও কথা ছিল, কিন্তু আমাদের খাওয়ার বহর দেখে চা খাইয়ে সামনের গাঁয়ে মুরগি কিনতে ছুটেছে। একা-একা এখানে ভূতের খপ্পরে বসে থাকব, এমন বান্দাই আমি নই।

কোথায় আর খুঁজব-কীই বা পাওয়া যাবে!

তবু চারজনে চলেছি। বাংলোর পেছনেই একটা জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। জঙ্গলটা যে খুব উঁচু তা নয়–কোথাও মাথা-সমান, কোথাও আর একটু বেশি। বেঁটে বেঁটে শাল-পলাশের গাছ কখনও কখনও ঘেঁটু আর আকন্দের ঝোপ। মাঝখান দিয়ে বেশ একটা পায়ে-চলা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এ-পথ দিয়ে কারা যে হাঁটে কে জানে। তাদের পায়ের পাতা সামনে না পেছন দিকে, তাই বা কে বলবে!

প্রথম-প্রথম বুক দুর-দুর করছিল। খালি মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি ঝোপের ভেতর থেকে হয় একটা স্কন্ধকাটা, নইলে শাঁকচুন্নি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই হল না। দুটো-চারটে বুনো ফল–পাখির ডাক আর সূর্যের মিষ্টি নরম আলোয় খানিক পরেই ভয়-ভয় ভাবটা মন থেকে কোথায় মুছে গেল।

www.bengaliebook.com

গোড়ার দিকে বেশ হুঁশিয়ার হয়েই হাঁটছিলুম—যাচ্ছিলুম ক্যাবলার পাশাপাশি। তারপর দেখি একটা বৈঁচি গাছ ইয়া-ইয়া বৈঁচি পেকে কালো হয়ে রয়েছে। একটা ছিড়ে মুখে দিয়ে দেখি—অমৃত! তারপরে আরও একটা—তারপরে আরও একটা

গোটা- পঞ্চাশেক খেয়ে খেয়াল হল, ওরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গ ধরতে হবে—হঠাৎ দেখি আমার পাশেই ঝোপের মধ্যে—

লম্বা শাদা মতো কী ওটা? নির্ঘাত ল্যাজ! কাঠবেড়ালির ল্যাজ।

কাঠবেড়ালি বড় ভালো জিনিস। ভন্টার মামা কোত্থেকে একবার একটা এনেছিল, সেটা তার কাঁধের ওপর চড়ে বেড়াত, জামার পকেটে শুয়ে থাকত। ভারি পোষ মানে। সেই থেকে আমারও কাঠবেড়ালি ধরবার বড় শখ। ধরি না খপ করে ওর ল্যাজটা চেপে!

যেন ওদিকে তাকাচ্ছিই না—এমনিভাবে গুটিগুটি এগিয়ে টক করে কাঠবেড়ালির ল্যাজটা আমি ধরে ফেললুম। তারপরেই হেঁইয়ো টান!

কিন্তু কোথায় কাঠবেড়ালি! যেই টান দিয়েছি, অমনি হাঁই-মাই করে একটা বিকট দানবীয় চিৎকার। সে চিৎকারে আমার কানে তালা গেলে গেল। তারপরেই কোথা থেকে আমার গালে এক বিরাশি সিক্কার চড়। ভৌতিক চড়।

সেই চড় খেয়ে আমি শুধু সর্ষের ফুলই দেখলুম না। সর্ষে, কলাই, মটর, মুগ, পাট, আম, কাঁঠাল-সব-কিছুর ফুলই এক সঙ্গে দেখতে পেলুম। তারপরই

সেই ঝোপের ভেতরে সোজা চিত। একেবারে পতন ও মুর্ছা। মরেই গেলুম কি না কে জানে!

কাঠবেড়ালির ল্যাজ নয় রে ওটা কাহার দাড়ি!

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি, আমি ডাক বাংলোর খাটে লম্বা হয়ে আছি। ঝাঁটু মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় হাওয়া করছে, ক্যাবলা পায়ের কাছে বসে মিটমিটে চোখে তাকিয়ে আছে আর পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে টেনিদা ঘুঘুর মত বসে রয়েছে।

ঝাঁটুর হাতের পাখাটা খটাস করে আমার নাকে এসে লাগতেই আমি বললুম, উফ!

চেয়ার ছেড়ে টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : যাক, তা হলে এখনও তুই মারা যাসনি!

ক্যাবলা বললে, মারা যাবে কেন? হোড়াসে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলেইছিলুম টেনিদা, ওর নাকে একটুখানি লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া দাও–এক্ষুনি চাঙা হয়ে উঠবে।

টেনিদা বললে, আর লঙ্কা-পোড়া! যেমনভাবে দাঁত ছরকুটে পড়েছিল, দেখে তো মনে হচ্ছিল, পটলডাঙা থেকে এখানে এসেই বুঝি শেষ পর্যন্ত পটল তুলল।

মাঝখান থেকে ঝাঁটু বিচ্ছিরি রকমের আওয়াজ করে হেসে বললে, দাদাবাবু ডর খিয়েছিলেন!

ক্যাবলা বললে, যাঃ-যাঃ, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না! এখন শিগগির এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে আয় দেখি!

ঝাঁটু পাখা রেখে বেরিয়ে গেল।

আমি তখনও চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছি। ডান চোয়ালে অসম্ভব ব্যথা। এমন চড় হাঁকড়েছে যে, গোটাদুয়েক দাঁত বোধহয় নড়িয়েই দিয়েছে একেবারে। চড়ের মতো চড় একখানা! অঙ্কের মাস্টারের বিরাশি সিক্কার চাঁটি পর্যন্ত এর কাছে একেবারে সুগন্ধি তিন-নং পরিমল নস্যি। আমি পটলডাঙার রোগা ডিগডিগে প্যালারাম, পালাজ্বরে ভুগি, আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই, এমন একখানা ভৌতিক চপেটাঘাতের পরেও আমার আত্মারাম কেন যে খাঁচাছাড়া হয়নি, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিলুম না।

টেনিদা বললে, আচ্ছা পুঁটিমাছ, তুই হঠাৎ ডাক ছেড়ে অমন করে অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন?

এ অবস্থাতেও পুঁটিমাছ শুনে আমার ভয়ানক রাগ হল, চোয়ালের ব্যথা-ট্যথা সব ভুলে গেলুম। ব্যাজার হয়ে বললুম, আমি পুঁটিমাছ আছি বেশ আছি, কিন্তু ওরকম একখানা বোম্বাই চড় খেলে তুমি ভেটকিমাছ হয়ে যেতে! কিংবা ট্যাপামাছ।

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, চাঁটি আবার তোকে কে মারলে?

—ভূত!

টেনিদা বললে, ভূত! ভূতের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। খামকা তোকে চাঁটি মারতে গেল? তাও সকালবেলায়? পাগল না পেট-খারাপ?

ক্যাবলা বললে, পেট-খারাপ। এদিকে ওই তো রোগা ডিগডিগে চেহারা, ওদিকে পৌঁছে অবধি সমানে মুরগি আর আণ্ডা চালাচ্ছে। অত সইবে কেন? পেট-গরম হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ভূত-টুত সব বোগাস।

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে, ঠিক। আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম।

ডান চোয়ালটা চেপে ধরে আমি এবার বিছানার ওপরে উঠে বসলুম।

—তোমরা বিশ্বাস করছ না?

টেনিদা বললে, একদম না। ভূতে আর চাঁটি মারবার লোক পেলে না!

ক্যাবলা মাথা নাড়ল; বটেই তো। আমাদের লিডার টেনিদার অ্যাঁয়সা একখানা জুতসই গাল থাকতে তোর গালেই কিনা চাঁটি হাঁকড়াবে? ওতে লিডারের অপমান হয়—তা জানিস?

শুনে টেনিদা কটমট করে ক্যাবলার দিকে তাকাল।

—ঠাট্টা করছিস?

ক্যাবলা তিড়িং করে হাত-পাঁচেক দূরে সরে গেল। জিভ কেটে বললে, কী সর্বনাশ! তোমাকে ঠাট্টা। শেষে যে গাঁট্টা খেয়ে আমার গালপাট্টা উড়ে যাবে। আমি বলছিলুম কি, ভূত এসে হ্যান্ডশেকই করুক আর বক্সিংই জুড়ে দিক, লেকিন ওটা দলপতির সঙ্গে হওয়াটাই দস্তুর।

টেনিদার কথাটা ভালো লাগল না। মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা-যাঃ, বেশি ক্যাঁচোর-ম্যাচোর করিসনি। কিন্তু তোকেও বলে দিচ্ছি প্যালা, এ বেলা থেকে তোর ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ! স্রেফ কাঁচকলা দিয়ে গাঁদালের ঝোল, আর রাত্তিরে সাবু বার্লি। আজকে মুচ্ছাে গিয়েছিলি, দু-চারদিন পরে একেবারেই যে মারা যাবি!

আমি রেগে বললুম, ধ্যাত্তোর তোমার সাবুবার্লির নিকুচি করেছে! বলছি সত্যিই ভূতে চাঁটি মেরেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

ক্যাবলা বললে, বটে? টেনিদা বললে, থাম, আর চালিয়াতি করতে হবে না।

আমি আরও রেগে বললুম, চালিয়াতি করছি নাকি? তা হলে এখনও আমার ডান গালটা টনটন করবে কেন?

টেনিদা বললে, অমন করে। খামকাই তো লোকের দাঁত কনকন করে, মাথা বনবন করে, কান ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে তাই বলে তাদের সকলকে ধরেই কি ভূতে ঠ্যাঙায় নাকি?

আমি এবারে মনে ভীষণ ব্যথা পেলুম। এত কষ্টেসৃষ্টে যদিই বা গালে একটা ভুতুড়ে চড় খেয়েছি, কিন্তু এই হতভাগারা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। ওরা নিজেরা খেতে পায়নি কিনা, তাই বোধহয় ওদের মনে হিংসে হয়েছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, কেন বিশ্বাস করছ না বলে তো? তোমরা তো গুটিগুটি . সামনে এগিয়ে গেলে। এর মধ্যে গোটাকয়েক বৈঁচি-টেচি খেয়ে আমি দেখলুম, ঝোপের

মধ্যে একটা কাঠবেড়ালির ল্যাজ নড়ছে। যেই সেটাকে খপ করে চেপে ধরেছি, অমনি

—অমনি কাঠবেড়ালি তোকে চড় মেরেছে?বলেই টেনিদা হা-হ্যা করে হাসতে লাগল। আবার ক্যাবলার নাক-মুখ দিয়ে শেয়ালের ঝগড়ার মতো খিকখিক করে কেমন একটা আওয়াজ বেরোতে শুরু করল।

এই দারুণ অপমানে আমার পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা নাচতে লাগল। আর সেই সঙ্গেই হঠাৎ নিজের ডানহাতের দিকে আমার চোখ পড়ল। আমার মুঠোর মধ্যে–

একরাশ শাদা শাদা রোঁয়া। সেই ল্যাজটারই খানিক ছিড়ে এসেছে নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললাম, এই দ্যাখো, এখনও কী লেগে রয়েছে আমার হাতে!

ক্যাবলা এক লাফে এগিয়ে এল সামনে। টেনিদা থাবা দিয়ে রোঁয়াগুলো তুলে নিলে আমার হাত থেকে।

তারপর টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : এ যে—এ যে–

ক্যাবলা আরও জোরে চেঁচিয়ে বললে, দাড়ি।

টেনিদা বললে, পাকা দাড়ি।

ক্যাবলা বললে, তাতে আবার পাটকিলে রঙ। তামাক-খাওয়া দাড়ি।

টেনিদা বললে, ভূতের দাড়ি!

ক্যাবলা বললে, তামাকখেকো ভূতের দাড়ি!

ভূতের দাড়ি! শুনে আর একবার আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জো হল। কী সর্বনাশ করেছি কী! শেষে কি কাঠবেড়ালির ল্যাজ টানতে গিয়ে ভূতের দাড়ি ছিড়ে এনেছি? তাই অমন একখানা মোক্ষম চড় বসিয়েছে আমার গালে! কিন্তু একখানা চড়ের ওপর দিয়েই কি আমি পার পাব? হয়তো কত যত্নের দাড়ি, কত রাত-বিরেতে শ্যাওড়া গাছে বসে ওই দাড়ি চুমরে-চুমরে ভূতটা খাম্বাজরাগিণী গাইত! অবশ্য খাম্বাজ রাগিণী কাকে বলে আমার জানা নেই, তবে নাম শুনলেই মনে হয়, ও-সব রাগ-রাগিণী ভূতের গলাতেই খোলতাই হয় ভালো। আমি সেই সাধের দাড়ি ছিড়ে নিয়েছি, এখন মাঝরাতে এসে আমার মাথার চুলগুলো উপড়ে নিয়ে না যায়। ক্যাবলা আর টেনিদা দাড়ি নিয়ে গবেষণা করুক— আমি হাত-পা ছেড়ে আবার বিছানার ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়লুম।

ক্যাবলা দাড়িগুলো বেশ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে বললে, কিন্তু টেনিদাভুতে কি তামাক খায়?

-কেন, খেতে দোষ কী?

—মানে ইয়ে কথা হল ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, লেকিন বাত এহি হ্যায়, ভূতে তো শুনেছি আগুন-টাগুন ছুঁতে পারে না—তাহলে তামাক খায় কী করে? তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে—এমনি পাকা, এমনি পাটকিলেরঙ-মাখানো দাড়ি যেন আমার চেনা, যেন এ-দাড়িটা কোথায় আমি দেখেছি।

ক্যাবলা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দু-পাটি জুতো হাতে করে ঘরের মধ্যে ঝাঁটু এসে ঢুকল। টেনিদার মুখের সামনে জুতোজোড়া তুলে ধরে বললে, এই দেখুন দাদাবাবু

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে, ব্যাটা কোথাকার গাড়ল রে! বলা হল প্যালার খাওয়ার জন্য দুধ আনতে, তুই আমার মুখের কাছে জুতোজাড়া এনে হাজির করলি? আমি কি ও-দুটো চিবোব নাকি বসে বসে?

ঝাঁটু বললে, রাম রাম! জুতো তো কুত্তা চিবোবে, আপনি কেন? আমি বলছিলাম, হাবুলবাবু কুথা গেল! জুতোটা বাহিরে পড়েছিল, হাবুলবাবুকে তো কোথাও দেখলম না। ফির জুতোর মধ্যে একটা চিঠি দেখলম, তাই নিয়ে এলম।

জুতোর মধ্যে চিঠি? আরে, তাই তো বটে। আমি জ্ঞান হওয়ার পরে তো সত্যিই এ-ঘরে হাবুল সেনকে দেখতে পাইনি!

ক্যাবলা বললে,তাই তো! জুতোর ভেতরে চিঠির মতো একটা কী রয়েছে যে! ব্যাপার কী, টেনিদা? হাবুলটাই বা গেল কোথায়?

টেনিদা ভাঁজ করা কাগজটা টেনে বের করে বললে, দাঁড়া না কাঁচকলা, আগে দেখি চিঠিটা।

কিন্তু চিঠির ওপর চোখ বুলোতেই–সে দুটো তড়াক করে একেবারে টেনিদার কপালে চড়ে গেল। বার-তিনেক খাবি খেয়ে টেনিদা বললে, ক্যাবলা রে, আমাদের বারোটা বেজে

গেল।

–বারোটা বেজে গেল। মানে?

–মানে–হাবুল গন।

–কোথায় গন?–আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলাম : চিঠিতে কী আছে টেনিদা? কী লেখা ওতে?

ভাঙা গলায় টেনিদা বললে, তবে শোন, পড়ি।

চিঠিতে খেলা ছিল :

হাবুল সেনকে আমরা ভ্যানিশ করিলাম। যদি পত্রপাঠ চাঁটিবাঁটি তুলিয়া আজই কলিকাতায় রওনা হও, তবে যাওয়ার আগে অক্ষত শরীরে হাবুলকে ফেরত পাইবে। নতুবা পরে তোমাদের চার মূর্তিকেই আমরা ভ্যানিশ করিব–এবং চিরতরেই তাহা করিব। আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিলাম, পরে দোষ দিতে পারিবে না।

ইতি–ঘচাং ফুঃ। দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু।

নস্যু কচাং কুঃ

টেনিদা ধপাস্ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল। ওর নাকের সামনে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাহাড়ি মৌমাছি উড়ছিল, অত বড় নাকটা দেখে বোধহয় ভেবেছিল, ওখানে একটা জুতসই চাক বাঁধা যায়। হঠাৎ টেনিদার নাক থেকে ঘড়াৎ-ঘড় করে এমনি একটা আওয়াজ বেরুল যে—সেটা ঘাবড়ে গিয়ে হাত তিনেক দূরে ঠিকরে পড়ল।

লিডারের অবস্থা তখন সঙিন। করুণ গলায় বললে, ওরে বাবা—গেলুম। শেষকালে কিনা চীনে দস্যুর পাল্লায়! এর চেয়ে যে ভূতও অনেক ভালো ছিল!

আমাক হাত-পাগুলো তখন আমার পিলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। বললুম, তার নাম আবার ঘচাং ফুঃ! অর্থাৎ ঘচাং করে গলা কেটে দেয়… তারপর ফুঃ করে উড়িয়ে দেয়।

ঝাঁটু মিটমিট করে তাকাচ্ছিল। আমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে, বেপার কী বটেক দাদাবাবু?

ক্যাবলা বললে, বেপার? বেপার সাজ্মাতিক। হ্যাঁ রে ঝাঁটু, এখানে ডাকাতফাকাত আছে নাকি?

-ডাকাত?-ঝাঁটু বললে, ডাকাত ফির ইখানে কেনে মরতে আসবেক? ই তল্লাটে উসব নাই।

নাঃ, নেই!-মুখখানাকে কচু-ঘণ্টর মতো করে টেনিদা খেকিয়ে উঠল; তবে ঘচাং ফুঃ কোত্থেকে এল? তাও আবার যে-সে নয়—একেবারে দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু।

ক্যাবলা কী পাখখায়াজ ছেলে। কিছুতেই ঘাবড়ায় না। বললে, আরে দুত্তোর—রেখে দাও ওসব? দেখলে তো, তা হলে কিছু নয়, সব ধাপ্পা! ঘচাং ফুর তো আর খেয়ে-

দেয়ে কাজ নেই–এই হাজারিবাগের পাহাড়ি বাংলোয় এসে ভ্যারেন্ডা ভাজবে! আসলে ব্যাপার কী জানো? স্রেফ বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস।

–বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস!-টেনিদা চোয়াল চুলকোতে চুলকোতে বললে : মানে?

-মানে? মানে আবার কী? ওই এনতার সব গোয়েন্দা গল্প–যেসব গল্পের পুকুরে সাবমেরিন ভাসায়, আর যাতে করে বাঙালী গোয়েন্দা দুনিয়ার সব অসাধ্য সাধন করে–সেই সমস্ত বই পড়ে এদের মাথায় এগুলো ঢুকেছে। আমার বড়মামা লালবাজারে চাকরি করে, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম–এই গোয়েন্দারা কোথায় থাকে। বড়মামা রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললে, কী একটা ককেতে থাকে।

–চুলোয় যাক গোয়েন্দা। টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তার সঙ্গে ঘচাং ফুঃর সম্পর্ক কী?

–আছে–আছে! ক্যাবলা সবজান্তার মতো বললে, যারা এই চিঠি লিখেছে, তারা গোয়েন্দা-গল্প পড়ে। পড়ে-পড়ে আমাদের ওপরে একখানা চালিয়াতি খেলেছে।

–কিন্তু এরকম চালিয়াতি করার মানে কী? আমাদের এখান থেকে তাড়াতেই বা চায় কেন? আর হাবুল সেনকেই বা কোথায় নিয়ে গেল?

ক্যাবলা বললে, সেইটেই তো রহস্য! সেটা ভেদ করতে হবে। কতকগুলো পাজি লোক নিশ্চয়ই আছে–আর কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু এই চিঠিটা দিয়ে এরা মস্ত উপকার করেছে টেনিদা!

–উপকার?–টেনিদা বললে, কিসের উপকার?

–একটা জিনিস তো পরিষ্কার বোঝা গেল, জিন-টিন এখানে কিছু নেই–ওসব একদম ভোঁ-কাট্টা! কতকগুলো ছ্যাঁচড়া লোক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে–এবাড়িটায়

তাদের দরকার। আমরা এসে পড়ায় তাদের অসুবিধে হয়েছে–তাই আমাদের তাড়াতে চায়। ক্যাবলা বুক টান করে বললে, কিন্তু আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে একদল ছিচকে লোকের ভয়ে পালাব টেনিদা? ওদের টাকের ওপরে টেক্কা মেরে জানিয়ে দিয়ে যাব, ওরা যদি ঘচাং ফুঃ হয় তা হলে আমরা হচ্ছি কচাং কুঃ।

কচাং কুঃ!-–আমি বললুম, সে আবার কী?

ক্যাবলা বললে, বাঘা চৈনিক দস্যু! দুর্ঘর্ষের ওপর আর-এক কাঠি!

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আমরা আবার চীনে হলুম কবে? দস্যুই বা হতে যাব কোন দুঃখে?

ক্যাবলা বললে, ওরা যদি চৈনিক হয়–আমাদেরই বা হতে দোষ কী? আমরাও ঘোরতর চৈনিক। ওরা যদি দস্যু হয়–আমরা নস্যু!

–নস্যু–টেনিদার নাক বরাবর আবার সেই মৌমাছিটা ফিরে আসছিল, সেটাকে তাড়াতে তাড়াতে টেনিদা বললে, নস্যু কাকে বলে?

–মানে, দস্যুদের যারা নস্যির মতো নাক দিয়ে টেনে ফেলে, তারাই হল নস্যু।

টেনিদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দ্যাখ ক্যাবলা, সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি নয়! যদি সত্যিই ওরা ডাকাত-টাকাত হয়–

ডাকাত হলে অনেক আগেই ওদের মুরোদ বোঝা যেত। বসে বসে ঝোপের মধ্যে। চীনেবাদাম খেত না, কিংবা কাগজে জড়িয়ে মড়ার মাথা ছুঁড়ত না। ওরাও এক নম্বর কাওয়ার্ড!

তা হলে হাবুল সেনকে নিয়ে গেল কী করে?

নিশ্চয়ই কোনও কায়দা করেছে। কিন্তু সে কায়দাটা সমঝে ফেলতে বহুত সময় লাগবে না। টেনিদা–

-কী?

—আর দেরি নয়। রেডি? টেনিদা বললে, কিসের রেডি?

—ঘচাং ফুঃ-দের কচাং কুঃ করতে হবে। আজই, এক্ষুনি।

টেনিদা তখনও সাহস পাচ্ছিল না। কুঁকড়ে গিয়ে বললে, সে কী করে হবে?

হয়ে যাবে একরকম। এই বাংলোর কাছাকাছিই ওদের কোনও গোপন আস্তানা আছে। হানা দিতে হবে সেখানে গিয়ে।

—ওরা যদি পিস্তল-টিস্তল ছোঁড়ে?

—আমরা ইট ছুঁড়ব!-ক্যাবলা ভেংচি কেটে বললে, রেখে দাও পিস্তল! গোয়েন্দা-গল্পে ওসব কথায় কথায় বেরিয়ে আসে, আসলে পিস্তল অত সস্তা নয়। হ্যাঁ–গোটাকয়েক লাঠি দরকার। এই ঝাঁটুলাঠি আছে রে?

ঝাঁটু চুপচাপ সব শুনছিল। কী বুঝছিল কে জানে, মাথা নেড়ে বললে, দুটো আছে। একটো বল্লমও আছে।

—তবে নিয়ে আয় চটপট।

-লাঠি বল্লমে কী হবেক দাদাবাবু? ঝাঁটুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—শেয়াল মারা হবে।

—শেয়াল মারা? কেনে? মাংস খাবেন?

–অত খবরে তোর দরকার কী? ক্যাবলা রেগে বললে, যা বলছি তোকে তাই কর। শিগগির নিয়ে আয় ওগুলো। চটপট।

ঝাঁটু লাঠি বল্লম আনতে গেল। টেনিদা শুকনো গলায় বললে, কিন্তু ক্যাবলা, এ বোধহয় ভালো হচ্ছে না। যদি সত্যিই বিপদ- আপদ হয় –

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, অতুমহারা ডর লাগ গিয়া? বেশ, তুমি তা হলে বাংলোয় বসে থাকো। আমি তো যাবই–এমনকি পালাজ্বরে-ভোগা এই প্যালাটাও আমার সঙ্গে। যাবে। দেখবে, তোমার চাইতে ওরও বেশি সাহস আছে।

শুনে আমার বুক ফুলে উঠল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পালাজ্বরের পিলেটাও নড়মড় করে উঠল–আমাকেও যেতে হবে! বেশ, তাই যাব! একবার ছাড়া তো দুবার মরব না।

আর আমি মারা গেলে–হ্যাঁ, মা কাঁদবে, পিসিমা কাঁদবে, বোধহয় সেকেন্ডারি বোর্ডও কাঁদবে কারণ, বছরবছর স্কুল-ফাইন্যালের ফি দেবে কে? আর বৈঠকখানা বাজারে দৈনিক আধপো পটোল আর চারটে শিঙিমাছ কম বিক্রি হবে–এক ছটাক বাসকপাতা বেঁচে যাবে রোজ। তা যাক! এমন বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্যে সংসারের একটু-আধটু ক্ষতি নয় হলই বা!

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল,–তবে যাই! কিন্তু প্যালার সেই দাড়িটা–

বললুম, তামাকখেকো দাড়ি।

ক্যাবলা বললে, ঠিক। মনেই ছিল না। ওই দাড়ি থেকেই আরও প্রমাণ হয়–ওরা চৈনিক নয়। কলকাতায় তো এত চীনা মানুষ আছে কারও দাড়ি দেখেছ কখনও?

তাই তো! দাড়িওলা চীনা মানুষ! না, আমরা কেউ তো দেখিনি। কখনও না।

এর মধ্যে ঝাঁটু লাঠি আর বল্লম এনে ফেলেছে। বল্লমটা ঝাঁটুই নিলে, একটা লাঠি নিলে ক্যাবলা—আর-একটা টেনিদা। আমি আর কী নিই? হাতের কাছে একটা চ্যালাকাঠ পড়েছিল, সেইটেই কুড়িয়ে নিলুম। যদি মরতেই হয়, তবু তো এক ঘা বসাতে পারব।

অতঃপর ঘচাং ফুঃ দস্যুর দলকে একহাত নেবার জন্যে দস্যু কচাং কুর দল আবার রওনা হল বীরদর্পে। আবার সেই বুনো রাস্তা। আমরা ঝোপঝাপ ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে দেখছিলুম, কোথাও সেই তামাকখেকো লুকিয়ে আছে কি না।

কিন্তু আবার আমি বিপদে পড়ে গেলুম। এবার বৈঁচি নয়—কামরাঙা।

বাংলোর ঠিক পেছন দিয়ে আমরা চলেছি। আমি যথানিয়মে পেছিয়ে পড়েছি আর ঠিক আমারই চোখে পড়েছে কামরাঙার গাছটা। আঃ, ফলে-ফলে একেবারে আলো হয়ে রয়েছে।

নোলায় প্রায় সেরটাক জল এসে গেল। জ্বরে ভুগে-ভুগে টক খাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে। ঘচাং ফুঃ টুঃ সব ভুলে গিয়ে গুটিগুটি গেলুম কামরাঙা গাছের দিকে। কলকাতায় এ সব কিছুই খেতে পাই না—চোখের সামনে অমন খোলতাই কামরাঙার বাহার দেখলে কার আর মাথা ঠিক থাকে।

যেই গাছতলায় পা দিয়েছি—

সঙ্গে সঙ্গেই-ইঃ! একতাল গোবরে পা পড়ল—আর তক্ষুনি এক আছাড়। কিন্তু এ কী। আছাড় খেয়ে আমি তো মাটিতে পড়লুম না। আমি যে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে পাতালে চলেছি। কিন্তু পাতালেও নয়। আমি একেবারে সোজা কার মস্ত একটা ঘাড়ের ওপর অবতীর্ণ হলুম। আঁই দাদা রে বলে সে আমাকে নিয়ে একেবারে পপাত।

আমি আর-একবার অজ্ঞান।

www.bengaliebook.com

গজেশ্বরের পাল্লায়

অজ্ঞান হয়ে থাকাটা মন্দ নয়—যতক্ষণ কাঠপিঁপড়েতে না কামড়ায়। আর যদি একসঙ্গে একঝাঁক পিঁপড়ে কামড়াতে শুরু করে তখন? অজ্ঞান তো দূরের কথা, মরা মানুষ পর্যন্ত তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে।

আমিও লাফ মেরে উঠে বসলুম।

কেমন আবছা-আবছা অন্ধকার গোড়াতে কিছু ভালো বোঝা গেল না। চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকছিল। খামকা বাঁকানের ওপর কটাৎ করে আর-একটা কাঠপিঁপড়ের কামড়।

বাপ রেবলে আমি কান থেকে পিঁপড়েটা টেনে নামালাম।

আর ঠিক তক্ষণাৎ কটকটে ব্যাঙের মতো আওয়াজ করে কে যেন হেসে উঠল। তারপর, ঘোড়ার নাকের ভেতর থেকে যেমন শব্দ হয় তেমনি করে কে যেন বললে, কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে বাপ রে বাপ রে বলছ, এর পরে যখন ভীমরুলে কামড়াবে, তখন যে মেসোমশাই-মেসোমশাই বলে ডাক ছাড়তে হবে।

তাকিয়ে দেখি-

ঠিক হাত দুয়েক দূরে একটা মুশকো জোয়ান ভাম-বেড়ালের মতো থাবা পেতে বসে আছে। কথাটা বলে সে আবার কটকটে ব্যাঙের মতো শব্দ করে হাসল।

আমার তখন সব কিরকম গোলমাল ঠেকছিল। বললুম, আমি কোথায়?

আমি কোথায়—লোকটা একরাশ বিচ্ছিরি বড় বড় দাঁত বের করে আমায় ভেংচে দিলে। তারপর ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেচিয়ে বললে, আহা-হা, ন্যাকা আর কি। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। হঠাৎ ওপর থেকে দুডুম করে পাকা

তালের মতো আমার পিঠের ওপর এসে নামলে, আর এখন সোনামুখ করে বলছ আমি কোথায়? ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি?

আমার সব মনে পড়ে গেল। সেই পাকা কামরাঙা-গুটি গুটি পায়ে সেদিকে এগোনো, গোবরে পা পিছলে-পড়া তারপরে-

আমি হাঁউ-মাউ করে বললুম, তবে কি আমি দস্যু ঘচাং ফুঃ আচ্ছায় এসে পড়েছি?

–ঘচাঃ ফুঃ? সে আবার কী?বলেই লোকটা সামলে নিল : হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বটে। বাবাজী অমনি একটা কী লিখেছিল বটে চিঠিতে।

বাবাজী? কে বাবাজী?

একটু পরেই টের পাবে। –লোকটা দাঁত খেচিয়ে বললে, চালাকি পেয়েছ? এত করে চলে যেতে বললুমভূতের ভয় দেখানো হল সারা রাত মশার কামড় খেয়ে ঝোপের মধ্যে বসে মড়ার মাথা-ফাতা ছুঁড়লুম-অট্টহাসি হেসে-হেসে গলা ব্যথা হয়ে গেল–তবু তোমাদের। গেরাহ্যি হয় না? দাঁড়াও এবার! একটাকে ভোগা দিয়ে এনেছি তুমিও এসে ফাঁদে পড়েছ; এবার তোমায় শিককাবাব বানিয়ে খাব!

–অ্যাঁ–শিককাবাব!

–ইচ্ছে হলে আলুকাবলিও বানাতে পারি। কিংবা ফাউল কাটলেট। চপও করা যায় বোধহয়। কিন্তু লোকটা চিন্তিতভাবে একবার মাথা চুলকাল, কিন্তু তোমাদের কি খাওয়া যাবে? এ-পর্যন্ত অনেক ছোকরা আমি দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মতো অখাদ্য জীব কখনও দেখিনি।

শুনে আমার কেমন ভরসা হল। মরতেই তো বসেছি–তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

বললুম, সেকথা ভালো! আমাদের খেয়ো না–অন্তত আমাকে তো নয়ই। খেলেও হজম করতে পারবে না। কলেরা হতে পারে, গায়ে চুলকুনি হতে পারে, ডিপথিরিয়া হতে পারে–এমনকি সর্দি-গর্মি হওয়াও আশ্চর্য নয়!

লোকটা বললে, থামো ছোকরা–বেশি বকবক কোরো না। আপাতত তোমায় নিয়ে যাব। ঠাণ্ডী গারদে–তোমার দোস্ত হাবুল সেনের কাছে। সেইখানেই থাকো এখন। ইতিমধ্যে বাবাজী ফিরে আসুন, তোমার বাকি দুটো দোস্তকেও পাকড়াও করিতারপর ঠিক করা যাবে তোমাদের দিয়ে মোগলাই পরোটা বানানো হবেনা ডিমের হালুয়া।

আমি বললুম, দোহাই বাবা, আমাকে খেয়ে না খেয়ে কিছু সুখ পাবে না-তা বলে। দিচ্ছি। আমি পালাজ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই কিছু রসকস নেই। আমাদের অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবু বলেন, আমি যমের অরুচি। আমাকে খেয়ে বেঘোরে মারা যাবে বাবা ঘচাং ফুঃ–

লোকটা রেগে বললে, আরে দেখে দাও তোমার ঘচাং ফুঘচাং ফুঃর নিকুচি করেছে। কেন বাপু, রাঁচির গাড়িতে বসে গুরুদেবের রসগোল্লা আর মিহিদানা খাওয়ার সময় মনে ছিল না? তাঁর যোগসর্পের হাঁড়ি সাবাড় করার সময় বুঝি একথা খেয়াল ছিল না যে আমাদেরও দিন আসতে পারে? নেহাত মুরি স্টেশনে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম-নইলে–

আমি ততক্ষণে হাঁ হয়ে গেছি। আমার চোখ দুটো ছানাবড়া নয়–একেবারে ছানার ডালনা!

-অ্যাঁ, তা হলে তুমি–

চিনেছ এতক্ষণে? আমি গুরুদেবের অধম শিষ্য গজের গাড়ুই।

–অ্যাঁ।

গজেশ্বর মিটমিট করে হেসে বললে, ভেবেছিলে মুরি স্টেশন পার হয়ে গাড়ি চলে গেল, আর তোমরাও পার পেলে। আমরা যে তার পরের গাড়িতেই চলে এসেছি, সেটা তো আর টের পাওনি! এবারে বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়।

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, পটলডাঙার প্যালারামের এবার বারোটা বেজে গেছে—ওই গজের ব্যাটা এবার আমায় নির্ঘাত সামী কাবাব বানিয়ে খাবে। নেহাত যখন মরবই, তখন ভয় করে কী হবে? বরং গজেশ্বরের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করি।

—কিন্তু তোমরা এখানে কেন? ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের বাংলোতে তোমাদের কী দরকার? এমন করে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছই বা কী জন্যে? আর যদি বসেই থাকো—গর্তের মধ্যে একতাল অত্যন্ত বাজে গোবর রেখে দিয়েছ কেন?

গজেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললে, গোবর কি আমরা রেখেছি নাকি? রেখেছে গোরুতে। তোমাদের মত গোবর-গণেশ তাতে পা দিয়ে সুড়ৎ করে পিছলে পড়বে—সেইজন্যেই বোধহয়।

—সে তো হল কিন্তু আমাদের তাড়াতে চাও কেন? এবাড়িতে তোমাদের কী দরকার?

—অত কথা দিয়ে তোমার কাজ কী হে চিংড়িমাছ? এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয়-ও-সব খবরে তোমার কী হবে?ব্যাজার মুখে গজেশ্বর একটা হাই তুলল।

আমাকে চিংড়িমাছ বলায় আমার ভীষণ রাগ হল। ডান কানের ওপর আর একটা কাঠপিঁপড়ে পুটুস করে ইনজেকশন দিচ্ছিল, উঃ করে সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললুম, আমাকে চপ-কাপলেট করে খেতে চাও খাও, কিন্তু খবরদার বলছি, চিংড়িমাছ বোলো না!

www.bengaliebook.com

-কেন বলব না? চিংড়ির কাটলেট বলব! গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল।

না, কক্ষনো বলবে না। আমি আরও রেগে গিয়ে বললুম, তা ছাড়া এখন আমার নাক টিপলে দুধ বেরোয় না। আমি দু-দুবার স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছি।

ইঃ–স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছে!–গজেশ্বর ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল : আচ্ছা বলল তো–ক্যাটাক্লিজম মানে কী?

ক্যাটাক্লিজম? ক্যাটাক্লিজম? আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, বেড়ালের বাচ্চা হবে বোধহয়?

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে গজেশ্বর বললে, তোমার মুণ্ডু! আচ্ছা বলল তোসেনিগেম্বিয়ার রাজধানী কী?

বললুম, নিশ্চয় হনোলুলু? নাকি, ম্যাডাগাস্কার?

–ভুগোলকে একেবারে গোলগপ্পার মতো খেয়ে নিয়েছ দেখছি।–গজেশ্বর নাক বেঁকিয়ে বললে, আচ্ছা বলল দেখি, জাড্যাপ মানে কী? অনিকেত কাকে বলে?

কী বললে–অনিমেষ? অনিমেষ আমার মামাতো ভাই।

হয়েছে, আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই। গজেশ্বর আবার ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেচিয়ে বললে, স্কুল-ফাইন্যাল কেন–তুমি ছাত্রবৃত্তিও ফেল করবে। নাঃসত্যিই দেখছি তুমি একদম অখাদ্য! বোধহয় শুক্তো করে এক-আধটু খাওয়া যেতে পারে। এখন উঠে পড়ো।

–কোথায় যেতে হবে?

বললুম তো, ঠাণ্ডী গারদে। সেখানে তোমার ফ্রেন্ড হাবলু সেন রয়েছে তার সঙ্গেও মমালাকাত হবে। ওদিকে আবার গুরুদেব গেছেন দলবল নিয়ে একটুখানি বিষয়কর্মে, তিনিও ফিরে আসুন—তারপর দেখা যাক–

ইতিমধ্যে আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলুম। বিপদে পড়ে পটলডাঙার প্যালারামের মগজও এক-আধটু সাফ হয়ে এসেছে। কোথায় এসে পড়েছি সেটাও একটু ভালো করে জানা দরকার।

যতটা বোঝা গেল, হাত সাত-আষ্টেক নীচে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে পড়েছি। যদি গজেশ্বরের পিঠের ওপর সোজা ধপাস করে না পড়তুম, তা হলে হাত-পা নির্ঘাত ভেঙে থেঁতলে যেত। যেখানে বসে আছি, সেটা একটা সুড়ঙ্গের মতো সামনের দিকে চলে গেছে। কোথায় গেছে কতটা গেছে বোঝা গেল না। তবে ওরই কোথাও ঠাণ্ডী গারদ আছে—সেইখানেই আপাতত বন্দি রয়েছে হাবুল সেন।

হাবুলের ব্যবস্থা পরে হবে কিন্তু আমি কি এখান থেকে পালাতে পারি না? কোনওমতেই না?

মাথার ওপর গোল কুয়ার মতো গর্তটা দেখা যাচ্ছে—যেখান দিয়ে আমি ভেতরে পড়েছি। লক্ষ্য করে আরও দেখলুম, গর্তের পাশ দিয়ে পাথরে পাথরে বেশ খাঁজকাটা মতো আছে। একটু চেষ্টা করলেই ঠকাৎ করে ওপরে–

এসব ভাবতে বোধহয় মিনিট দুই সময় লেগেছিল। এর মধ্যে বিড়িটা শেষ করেছে। গজেশ্বর মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

-বলি, মতলবটা কী হে? পালাবে? সে-গুড়ে বালি চাঁদ—স্রেফ বালি! বাঘের হাত থেকে ছাড়ান পেতে পারো, কিন্তু এই গজেশ্বর গাড়ইয়ের হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই! তার ওপর তুমি আবার আমার গুরুদেবের দাড়ি ছিড়ে দিয়েছ– তোমার কপালে কী যে আছে—একটা যাচ্ছেতাই মুখ করে গজেশ্বর উঠে দাঁড়াল।

www.bengaliebook.com

অ্যাঁ! তা হলে সেই তামাকখেকো ভূতুড়ে দাড়িটা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের। স্বামীজীই তবে ঝোপের মধ্যে বসি আড়ি পাতছিলেন, আর আমি কাঠবেড়ালির ল্যাজ মনে করে সেই স্বর্গীয় দাড়ি–

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমি কিন্তু ইচ্ছে করে দাড়ি ছিড়িনি। আমি ভেবেছিলুম–

–থাক–থাক! তুমি কী ভেবেছ তা আমার জেনে আর দরকার নেই। গালের ব্যথায় গুরুদেব দুঘণ্টা ছটফট করেছেন। তিনি ফিরে এলে–যাক সে কথা, ওঠো এখন–

গজেশ্বর হাতির শুড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে আমায় পাকড়াও করতে যাচ্ছিল–হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : বাপ রে গেলুম-আরে বাপ রে গেছি–

ততক্ষণে আমিও দেখেছি, কালো কটকটে একটা কাঁকড়া বিছে, গজেশ্বরের পায়ের কাছে তখনও দাঁড়া উঁচু করে যমদূতের মত খাড়া হয়ে আছে।

–গেলুম–গেলুম–ওরে বাবা-জ্বলে গেলুম–

বলতে বলতে সেই ষাঁড়ের মত জোয়ানটা মেঝের ওপর কুমড়োর মতো গড়াতে লাগল : গেছি–গেছি–একদম মেরে ফেলেছে–

আর আমি? এমন সুযোগ আর কি পাব? তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের খাঁজে পা লাগালুম–এইবার এসপার কি ওসপার।

শেঠ ঢুণ্ডুরাম

ওঠ জোয়ান-হেঁইয়ো! পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে যখন গর্তের মুখে উঠে পড়লুম, তখন আমার পালাজ্বরের পিলেটা পেটের মধ্যে কচ্ছপের মতো লাফাচ্ছে। অবশ্য কচ্ছপকে আমি কখনও লাফাতে দেখিনিসুড়সুড় করে শুড় বের করতে দেখেছি কেবল। কিন্তু কচ্ছপ যদি কখনও লাফায়–আনন্দে হাত-পা তুলে নাচতে

থাকে তা হলে যেমন হয়, আমার পিলেটা তেমন করেই নাচতে লাগল। একেবারে পুরো পাঁচ মিনিট।

পিলের নাচ-টাচ থামলে কামরাঙা গাছটার ডাল ধরে আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কোথাও কেউ নেই ক্যাবলা আর টেনিদা কোথায় গেছে কে জানে! ওধারে একটা আমড়া গাছে বসে একটা বানর আমাকে ভেংচি কাটছিল—আমিও দাঁত-টাত বের করে সেটাকে খুব খারাপ করে ভেংচে দিলুম। বানরটা রেগে গিয়ে বললে, কিচকিচ কিছু—বোধহয় বললে, তুমি একটা বিচ্ছু!—তারপর টুক করে পাতার আড়ালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পায়ের তলায় গর্তটার ভেতর থেকে গজেশ্বর গাড়ইয়ের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আমার বেশ লাগছিল। আমাকে বলে কিনা কাটলেট করে খাবে! যাচ্ছেতাই সব ইংরিজি শব্দের মানে করতে বলে আর জানতে চায় হনোলুলুর রাজধানীর নাম কী! বেশ হয়েছে। পাহাড়ি কাঁকড়া-বিছের কামড়—পুরো তিনটি দিন সমানে গান গাইতে হবে গজেশ্বরকে!

এইবার আমার চোখ পড়ল সেই কালান্তক গোবরটার দিকে। এখনও তার ভিতর দিয়ে পেছলানোর দাগ—ওই পাষণ্ড গোবরটাই তো আমায় পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ভারি রাগ হল, গোবরকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে ওটাকে আমি সজোরে পদাঘাত করলুম।

এহে-হে—এ কী হল। ভারি ছ্যাঁচড়া গোবর তো! একেবারে নাকে-মুখে ছিটকে এল যে! দুত্তোর!

কিন্তু এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গজেশ্বরকে বিশ্বাস নেই—হঠাৎ যদি উঠে পড়ে গর্তের ভেতর থেকে! সরে পড়া যাক এখান থেকে! পত্রপাঠ!

যাই কোন্ দিকে! ঝর্ণিপাহাড়ি বাংলোর ঠিক পেছন দিকে এসে পড়েছি সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু যাই কোন্ ধার দিয়ে! কীভাবে যে এসেছিলুম, ওই মোম আছাড়টা

www.bengaliebook.com

খাওয়ার পর মাথার ভেতর সে সমস্ত হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে। ডাইনে যাব, না বাঁয়ে? আমার আবার একটা বদ দোষ আছে। পটলডাঙার বাইরে এলেই আমি পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই আর চিনতে পারিনে। একবার দেওঘরে গিয়ে আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদাকে বলেছিলুম; দেখো ফুচুদা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! উত্তরদিক থেকে কী চমত্তার সূর্য উঠছে!–শুনে ফুচুদা কটাং করে আমার লম্বা কানে একটা মোচড় দিয়ে বলেছিল, স্ট্রেট এখান থেকে রাঁচি চলে যা প্যালা–মানে, রাঁচির পাগলা গারদে!

কোন্ দিকে যাব ভাবতে ভাবতেই আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া! কিংবা একেবারে চমচম! ওদিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুটিসুটি মেরে ও কারা আসছে? কাঠবেড়ালির ল্যাজের মতো ও কার দাড়ি উড়ছে হাওয়াতে?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ–নির্ঘাত। তাঁর পেছনে পেছনে আরও দুটো ষণ্ডা জোয়ান–তাদের হাতে দুটো মুখ বাঁধা সন্দেহজনক হাঁড়ি। নির্ঘাত যোগসর্পের হাড়ি-মানে, দই আর রসগোল্লা-ফোল্লা থাকা সম্ভব! একা একা নিশ্চয় খাবে না, খুব সম্ভব হাবুল সেনও ভাগ পাবে।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম রসগোল্লার ব্যাপারে একটুখানি দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু সেই লোভে আবার আমি গজেশ্বর গাড়ইয়ের পাল্লায় পড়তে চাই না উহু কিছুতেই না। বেঁচে কেটে পড়ি এখান থেকে।

সুটু করে আমি বাঁ পাশের ঝোপে ঢুকে গেলুম। দৌড়নো যাবে না–পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা। ঝোপের মধ্যে আমি সুড়সুড়িয়ে চললুম।

চলেছি তো চলেইছি। কোন্ দিকে চলেছি জানি না। ঝোপঝাড় পেরিয়ে, নালাফালা টপকে, একটা শেয়ালের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে, চলেছি আর চলেইছি। আবার যদি দস্যু ঘচাং ফুর পাল্লায় পড়ি–তা হলেই গেছি! গজেশ্বর যেরকম চটে রয়েছে আমাকে আবার পেলে আর দেখতে হবে না। সোজা শুক্তোই বানিয়ে ফেলবে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক এলোপাথাড়ি হাঁটবার পর দেখি, সামনে একটা ছোট্ট নদী। ঝুরঝুরে মিহি বালির ভেতর দিয়ে তিরতির করে তার নীলচে জল বয়ে চলেছে। চারদিকে ছোট বড় পাথর। আমার পা প্রায় ভেঙে আসবার জো–তেষ্টায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

পাথরের ওপর বসে একটুখানি জিরিয়ে নিলুম! আকাশটা মেঘলা–বেশ ছায়াছায়া জায়গাটা। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল! চারদিকে পলাশের বন–নদীর ওপারে আবার দুটো নীলকণ্ঠ পাখি।

একটুখানি জলও খেলুম নদী থেকে। যেমন ঠাণ্ডা–তেমনি মিষ্টি জল। খেয়ে একেবারে মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। দস্যু ঘচাং ফুঃ, গজেশ্বর, টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুলসব ভুলে গেলুম। মনে এত ফুর্তি হল যে আমার চা-রা-রা-রা-রা–রামা হো–রামা হো–বলে গান গাইতে ইচ্ছে করল।

কেবল চা-রা-রা-রা-রা–বলে তান ধরেছি হঠাৎ পেছনে ভোঁপ-ভোঁপ-ভোঁপ!

দুত্তোরএকেবারে রসভঙ্গ! তার চাইতেও বড় কথা এখানে মোটর এল কোত্থেকে? এই ঝন্টিপাহাড়ির জঙ্গলে?

তাকিয়ে দেখলুম, নদীর ধার দিয়ে একটা রাস্তা আছে বটে। আর-একটু দূরেই সেই রাস্তার ওপর পলাশবনের ছায়ায় একখানা নীল রঙের মোটর দাঁড়িয়ে।।

কী সর্বনাশ–এরাও ঘচাং ফুঃর দল নয় তো? ডিটেকটিভ গল্পে এইরকমই তো পড়া যায়! নিবিড় জঙ্গল–একখানা রহস্যজনক মোটর তিনটে কালো-মুখোশ পরা লোক, তাদের হাতে পিস্তল–আর ডিটেকটিভ হিমাদ্রি রায়ের চোখ একেবারে মনুমেন্টের চূড়ায়। ভাবতেই আমার পালাজ্বরের পিলেটা ধপাস করে লাফিয়ে উঠল। ফিরে কচ্ছপ-নৃত্য শুরু করে আর-কি!

www.bengaliebook.com

উঠে একটা রাম-দৌড় লাগাব ভাবছি–এমন সময় আবার ভোঁপ, ভোঁপ! মোটরটার হর্ন বাজল। তারপরেই গাড়ি থেকে যে নেমে এল, তাকে দেখে আমি থমকে গেলুম। না–কোনও দস্যুর দলে এমন লোক থাকতেই পারে না। কোনও গোয়েন্দা কাহিনীতে তা লেখেনি।

প্রকাণ্ড থলথলে ভুঁড়ি দেখলে মনে হয়, ক্রেনে করে তুলতে গেলে ক্রেন ছিড়ে পড়বে। গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা তৈরি করতে বোধহয় একথান কাপড় খরচ হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা বেলুনের মতো মুখক-টাকগুলো প্রায় ভেতরে ঢুকে বসে আছে। মাথায় একটা বিরাট হলদে রঙের পাগড়ি। গলা-টলার বালাই নেই–পেটের ভেতর থেকে মাথাটা প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মনে হয়। ঠিক থুতনির তলাতেই একছড়া সোনার হার চিকচিক করছে। দুহাতের দশ আঙুলে দশটা আংটি।

একখানা মোক্ষম শেঠজী।

নাঃ–এ কখনও দস্যু ঘচাং ফুঃর লোক নয়। বরং ঘচাং ফুঃদের নজর সচরাচর যাদের ওপর পড়ে–এ সেই দলের। কিন্তু এ রকম একটি নিটোল শেঠজী খামকা এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছে কেন?

শেঠজী ডাকলেন : খোঁকা–এ খোঁকা–

আমাকেই ডাকছেন মনে হল। কারণ, আমি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনও খোঁকাকে আমি দেখতে পেলুম না। সাত-পাঁচ ভেবে আমি গুটিগুটি এগোলুম তাঁর দিকে।

–নমস্তে শেঠজী।

–নমস্তে খোঁকা। –শেঠজী হাসলেন বলে মনে হল। বেলুনের ভেতর থেকে গোটাকতক দাঁত আর দুটো মিটমিটে চোখের ঝলক দেখতে পেলুম এবার। শেঠজী বললেন, তুমি কার লেড়কা আছেন? এখানে কী করতেছেন?

একবার ভাবলুম, সত্যি কথাটাই বলি। তারপরেই মনে হল কার পেটে যে কী মতলব আছে কিছুই বলা যায় না। এই ঝর্ণিপাহাড়ি জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়। শেঠজীর অত বড় ভুঁড়ির আড়ালেও রহস্যের কোনও খাসমহল লুকিয়ে আছে কি না কে বলবে!

তাই বোঁ করে বলে দিলুম, আমি হাজারিবাগের ইস্কুলে পড়তেছেন। এখানে পিকনিক করতে এসেছেন।

—হাঁ! পিকনিক করতে এসেছেন?—শেঠজীর চোখ দুটো বেলুনের ভেতর থেকে আবার মিটমিট করে উঠল : এতো দূরে? তা, দলের আউর সব লেড়কা কোথা আছেন?

—আছেন ওদিকে কোথাও। —আঙুল দিয়ে আন্দাজি যে-কোনও একটা দিক দেখিয়ে দিলুম। তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কে আছেন, এই জঙ্গলে আপনিই বা কী করতে এসেছেন?

হামি? শেঠজী বললেন, আমি শেঠ ঢুণ্ডুরাম আছি। কলকাতায় আমার দোকান আছেন রাঁচিমে ভি আছেন। এখানে আমি এসেছেন জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে।

—ওজঙ্গল—ইজারা লিবার জন্যে? আমার হঠাৎ কেমন রসিকতা করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু জঙ্গলে বেশি ঘোরাফেরা করবেন না শেঠজী—এখানে আবার ভালুকের উৎপাত

আছে।

-অ্যাঁ-ভালুক! শেঠ ঢুণ্ডুরামের বিরাট ভূঁড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল : ভালুক মানুষকে। কামড়াচ্ছেন?

—খুব কামড়াচ্ছেন! পেলেই কামড়াচ্ছেন!

—অ্যাঁ।

আমি শেঠজীকে ভরসা দিয়ে বললুম : ভুঁড়ি দেখলে আরও জোর কামড়াচ্ছেন। মানে ভালুকেরা ভুঁড়ি কামড়াতে ভালোবাসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—অ্যাঁ! রামরাম!

শেঠজী হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। অত বড় শরীর নিয়ে কেউ যে অমন জোরে লাফাতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

তারপর মন-চারেক ওজনের সিল্কের সেই প্রকাণ্ড বস্তাটা এক দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠল। উঠেই চেঁচিয়ে উঠল : এ ছগনলাল—আরে মোটরিয়া তো হাঁকাও! জলদি!

ভোঁপভোঁপ! চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ঢুণ্ডুরামের নীল মোটর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল! আর পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি পরমানন্দে হাসতে লাগলুম। বেড়ে রসিকতা হয়েছে একটা!

কিন্তু বেশিক্ষণ আমার মুখে হাসি রইল না। হঠাৎ ঠিক আমার পেছনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে—

—হালুম!

ভালুক নয়—ভালুকের বড়দা! অথাৎ বাঘ! রসিকতার ফল এমন যে হাতে-হাতে ফলে আগে কে জানত!

-বাপরে, গেছি বলে আমিও এক পেল্লায় লাফ! শেঠজীর চাইতেও জোরে। আর লাফ দিয়ে ঝপাং করে একেবারে নদীর কনকনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে। পেছন থেকে সঙ্গে সঙ্গে আবার জোর আওয়াজ : হালুম!

বাঘা কাণ্ড

বাপ্‌স্‌-বাকী ঠাণ্ডা জল! হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি লেগে গেল! আর স্রোতও তেমনি। পড়েছি হাঁটু জলে—কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ হাত দূরে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু জলসই না হলে যে বাঘসই—মানে, বাঘের জলযোগ হতে হবে এক্ষুনি! আঁকুপাঁকু করে নদী পার হতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম-খানিকটা জল ঢুকল নাক-মুখের মধ্যে। আর তক্ষুনি মনে হল, বাঘটা বুঝি এক্ষুনি পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

আর সেই মুহূর্তেই

পেছন থেকে বাঘের গর্জন নয়—অট্টহাসি শোনা গেল।

বাঘ হাসছে! বাঘ কি কখনও হাসতে পারে? চিড়িয়াখানায় আমি অনেক বাঘ দেখেছি। তারা হাম-হাম করে খায়, হুম-হুম করে ডাকে—নয় তো, ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। আমি অনেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি বাঘের কখনও নাক ডাকে কি না। আর যদি ডাকেই, সেটা কেমন শোনায়। একদিন বাঘের হাঁচি শোনবার জন্যে এক ডিবে নস্যি বাঘের নাকে ছুঁড়ে দেব ভেবেছিলুম-কিন্তু আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা ডিবেটা কেড়ে নিয়ে আমার চাঁদির ওপর কটাৎ করে একটা গাঁট্টা মারল। কিন্তু বাঘের হাসি যে কোনও-দিন শুনতে পাওয়া যাবে—সেকথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখব ভাবছি, সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা নুড়িতে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লুম। আবার সেই অট্টহাসি—আর কে যেন বললে উঠে আয় প্যালা, খুব হয়েছে! এর পরে নির্ঘাত ডবল-নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবি।

এ তো বাঘের গলা নয়!

আর কে? নির্ঘাত ক্যাবলা! পাশে টেনিদাও দাঁড়িয়ে। দুজনে মিলে দন্তবিকাশ করে পরমানন্দে হাসছে—যেন পাশাপাশি একজোড়া শাঁকালুর দোকান খুলে বসেছে।

টেনিদা তার লম্বা নাকটাকে কুঁচকে বললে, পেছন থেকে একটা বাঘের ডাক ডাকলুম আর তাতেই অমন লাফিয়ে জলে পড়ে গেলি! ছছাঃ-ছছাঃ—তুই একটা কাপুরুষ।

অ! দুজনে মিলে বাঘের আওয়াজ করে আমার সঙ্গে বিটকেল রসিকতা হচ্ছিল! কী ছোটলোক দেখছ! মিছিমিছি ভিজিয়ে আমার ভূত করে দিলে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে সারা গায়ে!

রেগে আগুন হয়ে আমি নদী থেকে উঠে এলুম। বললুম, খামকা এরকম ইয়ার্কির মানে কী?

ক্যাবলা বললে, তোরই বা এসব ইয়ার্কির মানে কী? দিব্যি আমাদের পেছনে শামুকের মতো গুড়ি মেরে আসছিলি—তারপরই একেবারে নো-পাত্তা! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলি। ওদিকে আমরা সারাদিন খুঁজে-খুঁজে হয়রান। শেষে দেখি—এখানে বসে মনের আনন্দে পাগলের মতো হাসা হচ্ছে! তাই তোর খরচায় আমরাও একটু হেসে নিলুম।

আমি বললুম, ইচ্ছে করে আমি হাওয়ায় মিলিয়েছিলুম নাকি? আমি তো পড়ে গিয়েছিলুম দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে।

–দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে। সে আবার কী?ওরা দুজনেই হাঁ করে চেয়ে রইল।

—কিংবা ঘুটঘুটানন্দেরগর্তেও বলতে পার।।

—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ! ক্যাবলা বারতিনেক খাবি খেল। টেনিদা তেমনি হাঁ করেই রইল—ঠিক একটা দাঁড়কাকের মতো।

—সেই সঙ্গে আছে গজেশ্বর গাড়ুই। সেই হাতির মতো লোকটা।

—অ্যাঁ!

—আর আছে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরগাড়ি।

—অ্যাাঁ!

ওরা একদম বোকা হয়ে গেছে দেখে আমার ভারি মজা লাগছিল! ভাবলুম চ্যার্যা-র্যার্যা করে গানটা আবার আরম্ভ করে দিই কিন্তু পেটের মধ্যে থেকে গুরগুরিয়ে ঠাণ্ডা উঠছে—এখন গাইতে গেলে গলা দিয়ে কেবল গিটকিরি বেরুবে। বললুম, বাংলোয় আগে ফিরে চলতারপরে সব বলছি।

সব শুনে ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না। স্বামী ঘুটঘুটানন্দই হচ্ছে ঘচাং ফুঃ! সঙ্গে সেই গজের গাড়ুই! তারা আবার পাহাড়ের গর্তের মধ্যে থাকে! যা-যাঃ! বাজে গল্প করবার আর জায়গা পাসনি!

টেনিদা বললে, নিশ্চয় জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে প্যালার পালাজ্বর এসেছিল। আর জ্বরের ঘোরে ওই সমস্ত উমধুষ্টম খেয়াল দেখেছিল।

আমি বললুম, বেশ, খেয়ালই সই! কাঁকড়াবিছের কামড়ের জেরটা মিটে যাক না আগে, তারপরে আসবে ওই গজেশ্বর গাড়ুই। তুমি আমাদের লিডার—তোমাকে ধরে ফাউল কাটলেট বানাবে!

www.bengaliebook.com

ক্যাবলা বললে, ফাউল মানে হল মুরগি। টেনিদা মুরগি নয় কারণ টেনিদার পাখা নেই; তবে পাঁঠা বলা যায় কি না জানিনে। মুশকিল হল, পাঁঠার আবার চারটে পা। আচ্ছা টেনিদা, তোমার হাত দুটোকে কি পা বলা যেতে পারে?

টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে গেল। চাঁটিটা ক্যাবলার মাথায় লাগল না লাগল চেয়ারের পিঠে। বাপ রে গেছি–বলে টেনিদা নাচতে লাগল খানিকক্ষণ।

নাচ-টাচ থামলে বললে, তোদের মতো গোটাকয়েক গাড়লকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে! ওদিকে হতচ্ছাড়া হাবলাটা যে কোথায় বসে আছে তার পাত্তা নেই। আমি একা কতদূর আর সামলাব!

-আহা-হা কত সামলাচ্ছ! ক্যাবলা বললে, তুম কেইসা লিডারউ মালুম হো গিয়া! তোমাকে যে কে সামলায় তার ঠিক নেই!

টেনিদা আবার চাঁটি তুলছিল-চেয়ার থেকে চট করে সটকে গেল ক্যাবলা।

আমি রেগে বললুম, তোমরা এই কয়রা বসেবসে। ওদিকে গজের ততক্ষণে হাবলাকে চপ করে ফেলুক।

ক্যাবলা বললে, মাটন চপ। হাবলাটা একনম্বরের ভেড়া। কিন্তু আপাতত ওঠা যাক টেনিদা। প্যালা সত্যি বলছে কি না একবার যাচাই করে দেখা যাক। চল প্যালা–কোথায় তোর ঘুটঘুটানন্দের গর্ত একবার দেখি। ওঠো টেনিদা–কুইক।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, দাঁড়া, একবার ভেবে দিকি।

ক্যাবলা বললে, ভাব্বার আর কী আছে? রেডি কুইক মার্চ। ওয়ান-টু-থ্রি-

টেনিদা কুইনিন-চিবানোর মতো মুখ করে বললে, মানে, আমি ভাবছিলুম-ঠিক এভাবে পাহাড়ের গুহায় ঢোকাটা কি ঠিক হবে? আমাদের তো দু-এক গাছা লাঠি

ছাড়া আর কিছু নেই—ওদের সঙ্গে হয়তো পিস্তল বন্দুক আছে। তা ছাড়া ওদের দলে হয়তো অনেকগুলো গুণ্ডা—আমরা মোটে তিনজন—ঝাঁটুটাও বাজার করতে গেছে—

ক্যাবলা বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কী আর হবে টেনিদা? বড়জোর মেরে ফেলবে—এই তো? কিন্তু কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরে যাওয়া অনেক ভালল! নিজের বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কতকগুলো গুণ্ডার ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব টেনিদা? পটলডাঙার ছেলে হয়ে?

বললে বিশ্বাস করবে না ক্যাবলার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও যেন কেমন তেজ এসে গেল! ঠিক কথা-করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা! পালাজ্বরে ভুগে-ভুগে এমনভাবে নেংটি ইদুরের মতো বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না! ছ্যাছা! আরে—একবার বই তো দুবার মরব না!

তাকিয়ে দেখি, আমাদের সদার টেনিদাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ভিতু মানুষটা নয়—গড়ের মাঠের গোরা পিটিয়ে যে চ্যাম্পিয়ন—এ সেই লোক। বাঘের মতো গলায় বললে, ঠিক বলেছিস ক্যাবলা—তুই আজকে আমার আক্কেল দাঁত গজিয়ে দিয়েছিস। একটা নয়—একজোড়া! হয় হাবুল সেনকে উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরে যাব, নইলে এ পোড়া প্রাণ রাখব না!

-হ্যাঁ, একেই বলে লিভার! এই তো চাই।

তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম তিনজনে। ওদের দুটো লাঠি তো ছিলই। আমার সেই ভাঙা ডালটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল, অগত্যা একটা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে চললুম।

www.bengaliebook.com

এবার আর জায়গাটা চিনতে ভুল হল না। এই তো সেই কামরাঙা গাছ। এই তো সেই পাষণ্ড গোবরটা, যেটা আমাকে পিছলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু গর্তটা? গর্তটা গেল কোথায়?

গর্তের কোনও চিহ্নই নেই। খালি একরাশ ঝোপঝাড়।

ক্যাবলা বললে, কই রে-তোর সে গহ্বর গেল কোথায়?

-তাই তো!-

টেনিদা বললে, আমি তক্ষুনি বলেছিলুম-প্যালা, জ্বরের ঘোরে তুই খোয়াব দেখেছিস! স্বামী ঘুটঘুটানন্দ হল কিনা দস্যু ঘচাং ফু! পাগল না প্যাঁজফুলুরি।

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। সত্যিই কি জ্বরের ঘোরে আমি খোয়াব দেখেছি। তাহলে এখনও গায়ে টনটনে ব্যথা কেন? ওই তো গোবরে আমার পা পেছোনোর দাগ। তাহলে?

ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি? পাখি ওড়ে, রসগোল্লা উড়ে যায়, চপ কাটলেট হাওয়া হয়–মানে পেটের মধ্যে; কিন্তু অত বড় গর্তটা যে কখনও উড়ে যেতে পারে–সে তো কখনও শুনিনি।

টেনিদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, তোর গর্ত আমাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে বুঝলি? এই বলেই বীরদর্পে ঝোপের ওপর এক পদাঘাত।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপটায় যেন ভূমিকম্প জাগল। তার চাইতেও বেশি ভূমিকম্প জাগল টেনিদার গায়ে।–আরে আরে বলে চেঁচিয়ে উঠেই ঝোপঝাড় সুদ্ধ টেনিদা মাটির তলায় অদৃশ্য হল। একেবারে সীতার পাতাল প্রবেশের মতো। তলা থেকে শব্দ উঠল–খচ্ খচ্, ধপাস!

ওগুলো তবে ঝোপ নয়? গাছের ডাল কেটে গর্তের মুখটা ঢেকে রেখেছিল?

আমি আর ক্যাবলা কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী বলব–কী যে করব–কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

সেই মুহূর্তেই গর্তের ভেতর থেকে টেনিদার চিঙ্কার শোনা গেল-ক্যাবলা–প্যালা–

আমরা চেঁচিয়ে জবাব দিলুম, খবর কী টেনিদা?

–একটু লেগেছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তোরা শিগগির গর্তের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ভেতরে নেমে আয়! ভীষণ ব্যাপার এখানে–লোমহর্ষণ কাণ্ড!

শুনে আমাদের লোম খাড়া হয়ে গেল। আমার মনে পড়ল করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা! আমি তক্ষণাৎ গর্তের মুখে পা দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম ক্যাবলাও আমার পেছনে।

হাবুল সেনের মৃতদেহ

আমি আর ক্যাবলা টপাটপ নীচে নেমে পড়লুম। নেমেই দেখি, কোথাও কিছু নেই। টেনিদা নয়–গজেশ্বর নয়–স্বামী ঘুটঘুটানন্দর হেঁড়া দাড়ির টুকরোটুকুও নয়।

ব্যাপার কী! ঘচাং ফুঃর দল টেনিদাকেও ভ্যানিশ করে দিয়েছে নাকি?

ক্যাবলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, টেনিদা তো এখানেই এক্ষুনি পড়ল রে। গেল কোথায়?

আমি এতক্ষণে কিন্তু আবছা আবছা আলোয় সাবধানে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কাঁকড়াবিছেটাকে খুঁজছিলুম। সেটা আশেপাশে কোথাও ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি না কে জানে! তার মোক্ষম ছোবল খেয়ে ওই গুণ্ডা গজেশ্বর কোনওমতে

সামলেছে কিন্তু আমাকে কামড়ালে আর দেখতে হচ্ছে না—পটলডাঙার পালাজ্বর-মাকা প্যালারামের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

ক্যাবলা আমার মাথায় একটা থাবড়া মেরে বললে, এই টেনিদা গেল কোথায়?

—আমি কেমন করে জানব!

ক্যাবলা নাক চুলকে বললে, বড়ী তাজ্জব কী বাত! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি?

কিন্তু পটলডাঙার টেনিদা—আমাদের জাঁদরেল লিডার—এত সহজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পাত্র? তৎক্ষণাৎ কোত্থেকে আবার টেনিদার অশরীরী চিৎকার : ক্যাবলা—প্যালা—চলে আয় শিগগির! ভীষণ ব্যাপার।

যাব কোথায়! কোন্‌খান থেকে ডাকছ? এ যে সত্যিই ভুতুড়ে ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। আমার মাথার চুলগুলো সঙ্গে সঙ্গে কড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে বললে, টেনিদা, তুমি কোথায়? তোমার টিকির ডগাও যে দেখা যাচ্ছে না!

আবার কোথা থেকে টেনিদার অশরীরী স্বর : আমি একতলায়।

–একতলায় মানে?

টেনিদা এবার দাঁত খিচিয়ে বললে, কানা নাকি? সামনের দেওয়ালে গর্ত দেখতে পাচ্ছিসনে?

আরে—তাই তো! এদিকের পাথরের দেওয়ালে একটা গর্তই তো বটে! কাছে এগিয়ে দেখি, তার সঙ্গে একটা মই লাগানো ভেতর থেকে। যাকে বলে, রহস্যের খাসমহল।

টেনিদা বললে, বেয়ে নেমে আয়। এখানে ভয়াবহ কাণ্ড—লোমহর্ষণ ব্যাপার।

অ্যাঁ!

ক্যাবলাই আগে মই বেয়ে নেমে গেল—পেছনে আমি। সত্যিই তো—একতলাই বটে। যেখানে নামলুম, সেটা একটা লম্বা হলঘরের মতো—কোথেকে আলো আসছে জানি

কিন্তু বেশ পরিষ্কার। তার একদিকে একটা ইটের উনুন—গোটা-দুতিন ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি—এক কোনায় একটা ছাইগাদা আর তার মাঝখানে

টেনিদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। ওধারে হাবুল সেন পড়ে আছে—একেবারে ফ্ল্যাট।

টেনিদা হাবুলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই দ্যাখ!

ক্যাবলা বললে, হাবুল!

আমি বললাম, অমন করে আছে কেন?

টেনিদার গলা কাঁপতে লাগল : নিশ্চয় ওকে খুন করে রেখে গেছে!

আমার যে কী হল জানি না। খালি মনে হতে লাগল, ভয়ে একটা কচ্ছপ হয়ে যাচ্ছি। আমার হাত-পা একটু-একটু করে পেটের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমার পিঠের ওপরে যেন শক্ত খোলা তৈরি হচ্ছে একটা। আর একটু পরে গুড়গুড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে নামব।

আমি কোনওমতে বলতে পারলাম : ওটা হাবুল সেনের মৃতদেহ!

কথা নেই বার্তা নেই—টেনিদা হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললে : ওরে হাবলা রে! এ কী হল রে! তুই হঠাৎ খামকা এমন করে বেঘোরে মারা গেলি কেন রে!

ওরে কলকাতায় গিয়ে তোর দিদিমাকে আমি কী বলে বোঝাব রে! ওরে—কে আর আমাদের এমন করে আলুকাবলি আর ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াবে রে!

ক্যাবলা বললে, আরে জী, রোও মৎ। আগে দ্যাখো—জিন্দা আছে কি মুদা হয়ে গেছে।

আমারও খুব কান্না পাচ্ছিল। হাবুল প্রায়ই ওর দিদিমার ভাঁড়ার লুঠ করে আমের আচার আর কুলচুর এনে আমায় খাওয়াত। সেই আমের আচারের কৃতজ্ঞতায় আমার বুকের ভেতরটা হায়-হায় করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাক-টাক মুছে ফেললুম। আমার আবার কী যে বিচ্ছিরি স্বভাব কান্না পেলেই কেমন যেন সর্দি-উর্দি হয়ে যায়।

বারতিনেক নাক টেনে আমি বললুম, আলবাত মরে গেছে। নইলে অমন করে পড়ে থাকবে কেন?

ক্যাবলাটার সাহস আছে—সে গুটিগুটি এগিয়ে গিয়ে হাবুলের মৃতদেহের পেটে একটা খোঁচা মারল। আর, কী আশ্চর্য ব্যাপার—অমনি মৃতদেহ উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

বাপ রে ভূত হয়েছে! বলেই আমি একটা লাফ মারলুম। আর লাফিয়ে উঠতেই টেনিদার খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটার একটা ধাক্কা আমার মাথায়। কী শক্ত নাক—মনে হল যেন চাঁদিটা স্রেফ ফুটো হয়ে গেছে!নাক গেলনাক গেল বলে টেনিদা একটা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, আর ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়লুম আমি।

আর তক্ষুনি দিব্বি ভালো মানুষের মতো গলায় হাবুল বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা খাইয়া খাসা ঘুমাইতে আছিলাম, দিলি ঘুমটার দফা সাইর্যা!

তখন আমার খটকা লাগল। ভূতেরা তো চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলে—এ তো বেশ ঝরঝরে বাংলা বলে যাচ্ছে। আর, পরিষ্কার ঢাকাই বাংলা।

টেনিদা খ্যাঁচখ্যাঁচ করে উঠল :

—আহা-হা কী আমার রাজশয্যে পেয়েছেন রে—যে নবাবি চালে ঘুমোচ্ছন। ইদিকে তখন থেকে আমরা খুঁজে মরছি হতচ্ছাড়ার আকেলটা দ্যাখো একবার।

হাবুল আয়েশ করে একটা হাই তুলে বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা সাঁইট্যা জব্বর ঘুমখানা আসছিল। তা, গজাদা কই? স্বামীজী কই গেলেন?

টেনিদা বললে, ইস, বেজায় যে খাতির দেখছি। স্বামীজী—গজাদা!

হাবুল বললে, খাতির হইব না ক্যান? কাইল বিকালে আইছি—সেই থিক্যা সমানে খাইতাছি। কী আদর- যত্ন করছে—মনে হইল য্যান ঠিক মামাবাড়ির আইছি। তা, তারা গেল কই?

ক্যাবলা বললে, তারা গেল কই—সে আমরা কী করে জানব? তা, তুই কী করে ওদের পাল্লায় পড়লি? এখানে এলিই বা কী করে?

ক্যান আসুম না? একটা লোক আইস্যা আমারে কইল, খোকা—এইখানে পাহাড়ের তলায় গুপ্তধন আছে। নিবা তো আইস। বড়লোক হওনের অ্যাঁমন সুযোগটা ছাড়ুম ক্যান? এইখানে চইল্যা আইছি। স্বামীজী—গজাদা—আমারে যে যত্ন করছে কী কমু!

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, হ, কী আর কব! এখানে বসে উনি রাজভোগ খাচ্ছেন, আর আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি।

ক্যাবলা বললে, এসব কথা এখন থাক। এই গর্তের মধ্যে ওরা কজন থাকত রে?

জনচারেক হইব।

কী করত?

www.bengaliebook.com

কেমনে জানুম? একটা কলের মতো আছিল–সেইটা দিয়া খুটুর-খুটুর কইরা কী য্যান ছাপাইত। সেই কলডাও তো দ্যাখতে আছি না। চা গেল নাকি? আহা হা, বড় ভালো খাইতে আছিলাম রে!–হাবুলের বুক ভেঙে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল একটা।

-থাক তোর খাওয়া।–টেনিদা বললে, চল এবার বেরুনো যাক এখান থেকে। আমরা সময়মতো এসে পড়েছিলুমনইলে খাইয়ে খাইয়েই তোকে মেরে ফেলত।

আমি বললুম, উহু, মোটা করে শেষে কাটলেট ভেজে খেত!

ক্যাবলা বললে, বাজে কথা বন্ধ কর। হ্যাঁ রে হাবুল–ওরা কী ছাপ রে?

ক্যামন কইরা কই? ছবির মতো কী সব ছাপাইত।

–ছবির মতো কী সব! ক্যাবলা নাক চুলকোতে লাগল : পাহাড়ের গর্তের মধ্যে চুপি চুপি! বাংলোতে লোক এলেই তাড়াতে চাইত। জঙ্গলের মধ্যে একটা নীল মোটর! শেঠ ঢুণ্ডুরাম।

টেনিদা বললে, চুলোয় যাক শেঠ ঢুণ্ডুরাম! হাবুলকে পাওয়া গেছে-আপদ মিটে গেছে। ওটা নয় হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা সাবড়েছে কিন্তু আমাদের পেটে যে ছুঁচোর দল সংকীর্তন গাইছে রে! চল বেরোই এখান থেকে-

আমি বললুম, আবার ওই মই বেয়ে?

হাবুল বললে, মই ক্যান্? এইখান দিয়েই তো যাওনের রাস্তা আছে।

–কোন্ দিকে রাস্তা?

–ওই তো সামনেই।

হাবুলই দেখিয়ে দিলে। হলঘরের মতো সুড়ঙ্গটা পেরুতেই দেখি, বাঃ। একেবারে যে সামনেই পাহাড়ের একটা ভোলা মুখ! আর কাছেই সেই নদীটা—সেই শালবন।

ক্যাবলা বললে, কী আশ্চর্য, তুই তো ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতিস হাবলা।

হাবুল বললে, পালাইতে যামু ক্যান? অমন আরামের খাওন-দাওন। ভাবছিলাম—দুই-চাইরটা দিন থ্যাইকা স্বাস্থ্যটারে এইটু ভালো কইর্যা লই।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, ভালো কইরা। হতচ্ছাড়া-পেটুকদাস! তোকে যদি গজেশ্বর কাটলেট বানিয়ে খেত, তাহলেই উচিত শিক্ষা হত তোর।

কিন্তু বলতে বলতেই-

হঠাৎ মোটরের গর্জন। মোটর! মোটর আবার কোত্থেকে? আবার কি শেঠ ঢুণ্ডুরাম?

হ্যাঁ—ঢুণ্ডুরামই বটে। সেই নীল মোেটরটা। কিন্তু এদিকে আসছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ—তারপর পাতার আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। যেন আমাদের ভয়েই উর্ধ্বশ্বাসে পালাল ওটা।

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই মোটরে কার যেন একমুঠো দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। তামাক-খাওয়া লালচে পাকা দাড়ি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি?

চিড়িয়া ভাগল বা

দূরে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরটাকে চলে যেতে দেখেই ক্যাবলা বললে, চুকচুকচ্ছু! টেনিদা জিজ্ঞেস করলে, কী হল রে ক্যাবলা?

–কী আর হবে? চিড়িয়া ভাগল বা।

—চিড়িয়া ভাগল বা মানে?

আমি বললুম, বোধহয় চিড়ে-টিড়ের ভাগ হবে। চিড়ে কোথায় পেলি রে ক্যাবলা? দে না চাট্টি খাই! বড্ড খিদে পেয়েছে।

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, বহুৎ হুয়া, আর ওস্তাদি করতে হবে না। চিড়ে নয় রে বেকুব–চিঁড়ে নয়–চিড়িয়া ভাগল বা মানে হল, পাখি পালিয়েছে।

আমি বললুম, পাখি? নাঃ-পালায়নি তো! ওই তো দুটো কাক ওই গাছের ডালে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, দুত্তোর! এই প্যালাটার মগজে খালি বাসক পাতার রস আর শিঙিমাছ ছাড়া আর কিছু নেই। শেঠ ঢুণ্ডুরামের মোটরে করে সব পালাল দেখছিস না? স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি দেখতে পাসনি?

—পালিয়েছে তো হয়েছে কী? টেনিদা বলল, আপদ গেছে।

হাবুল তখন দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। একহাঁড়ি রসগোল্লার নেশা ওর কাটেনি। হঠাৎ আলোর-খোঁচা-খাওয়া প্যাঁচার মতো চোখ মেলে বললে, আহা-হা, গজাদা চইল্যা গেল? বড় ভালো লোক আছিল গজাদা!

ক্যাবলা বললে, তুই থাম হাবুল, বেশি বকিসনি। গজাদা ভালো লোক? ভালো লোকই তো বটে! তাই তো বাংলো থেকে আমাদের তাড়াতে চায় তাই পাহাড়ের গর্তের মধ্যে বসে কুটুর কুটুর করে কী সব ছাপে! আর শেঠ ঢুণ্ডুরাম কী মনে করে একটা নীল মোটর নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়ায়? ক্যাবলা পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল, হুঁ-হুঁ-হুঁ! আমি বুঝতে পেরেছি।

টেনিদা বললে, খুব যে ডাঁটের মাথায় ই করছিস! কী বুঝেছিস বল তো?

ক্যাবলা সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকাল। তারপর গলাটা ভীষণ গম্ভীর করে বললে, আমাদের দলে কাপুরুষ কে কে?

এমন করে বললে যে, আমার পালাজ্বরের পিলেটা একেবারে গুরগুর করে উঠল। একবার অঙ্কের পরীক্ষার দিনে পেটব্যথা হয়েছে বলে মটকা মেরে পড়েছিলুম। মেজদা তখন ডাক্তারি পড়ে—আমার পেটব্যথা শুনে সে একটা আট হাত লম্বা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইনজেকশন দিতে এসেছিল, আর তক্ষুনি পেটের ব্যথা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পায়নি। ক্যাবলার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল সেও যেন এইরকম একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমায় তাড়া করছে।

আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলুম—একমাত্র আমিই কাপুরুষ, কিন্তু সামলে গেলুম।

টেনিদা বললে, কাপুরুষ কে? আমরা সবাই বীরপুরুষ।

—তাহলে চলো-যাওয়া যাক।

—কোথায়?

—ওই নীল মোটরটাকে পাকড়াও করতে হবে।

বলে কী, পাগল না পাঁপড়-ভাজা! মাথা-খারাপ না পেট-খারাপ। মোটরটা কি ঘুটঘুটানন্দের লম্বা দাড়ি যে হাত বাড়িয়ে পাকড়াও করলেই হল।

হাবুল সেন বললে, পাকড়াও করবা কেমন কইর্যা? উইর‍্যা যাবা নাকি?

ক্যাবলা বললে, চল—বড় রাস্তায় যাই। ওখান দিয়ে অনেক লরি যাওয়া-আসা করে, তাদের কিছু পয়সা দিলেই আমাদের তুলে নেবে।

—আর ততক্ষণ নীল মোটরটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাকবে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

-নীল মোটর আর যাবে কোথায় বড়-জোর রামগড়। আমরা রামগড়ে গেলেই ওদের ধরতে পারব।

—যদি না পাই? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

-আবার ফিরে আসব।

—কিন্তু মিথ্যে এসব দৌড়ঝাঁপের মানে কী? টেনিদা বললে, খামকা ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করেই বা লাভ কী হবে? পালিয়েছে, আপদ গেছে। এবার বাংলোয় ফিরে প্রেমসে মুরগির ঠ্যাং চর্বণ করা যাবে। ওসব বিচ্ছিরি হাসিটাসিও আর শুনতে হবে না রাত্তিরে।

ক্যাবলা বুক থাবড়ে বললে, কভি নেহি। আমাদের বোকা বানিয়ে ওর চলে যাবে সারা পটলডাঙার যে বদনাম হবে তাতে। তারপর আর পটলডাঙায় থাকা যাবে না-সোজা গিয়ে আলু-পোস্তায় আস্তানা নিতে হবে। ও-সব চলবে না, দোস্ত। তোমরা সঙ্গে যেতে না চাও, না গেলে। কিন্তু আমি যাবই।

টেনিদা বললে, একা?

—একা।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—আমরাও তা হলে বেরিয়ে পড়ি।

আমি শেষবারের মতো চাঁদির ওপরটা চুলকে নিলুম।

—কিন্তু ওদের সঙ্গে যে গজেশ্বর আছে। কাঁকড়াবিছের কামড়ে সেবার একটু জব্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার যদি হাতের মুঠোয় পায় তাহলে সকলকে কাটলেট বানিয়ে খাবে। পেঁয়াজ-চচ্চড়িও করতে পারে। কিংবা পোস্তর বড়া।

—কিংবা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল ক্যাবলা তিনটে দাঁত বের করে দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই রকম ভেংচে দিলে : তাহলে তুই একাই থাক এখানে আমরা চললুম।

পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলকে অপমান করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। পটোল নিয়ে ইয়ার্কি নয়, হুঁ-হুঁ। আমাদের পাড়া হচ্ছে কলকাতার সেরা পাড়া—তার নাম পটলডাঙা। মানুষ মরে গেলে তাকে পটল তোলা বলে। আমার এক মাসতুতো ভাই আছে—তার নাম পটল; সে একসঙ্গে দেড়শো আলুর চপ আর দুশশা বেগুনি খেতে পারে! ছোড়দির একটা পাঁঠা ছিল—সেটার নাম পটল—সে মেজদার একটা শখের শাদা নাগরাকে সাত মিনিট তেরো সেকেন্ডের মধ্যে খেয়ে ফেলেছিল—ঘড়ি ধরে মিলিয়ে দেখেছিলুম আমি। আর, শিঙিমাছের কথা কে না জানে! আর কোন মাছের শিং আছে? মতান্তরে ওকে সিংহমাছও বলা যায়—মাছেদের রাজ্যে ও হল সিংহ। আর তোরা কী খাস বল। আলু, পোনামাছ। আলু শুনলেই মনে পড়ে আলু প্রত্যয়। সেইসঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের বিচ্ছিরি গাঁট্টা। আর পোনা। ছোঃ! লোকে কথায় বলে-ছানাপোনা—পুকে এত্তোটুকু। কোথায় সিংহ, আর কোথায় পোনা! কোনও তুলনা হয়। রামচন্দ্র!

আমি যখন এইসব তত্ত্বকথা ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় আমার কান কটকট করছে, তখন হঠাৎ দেখি ওরা দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফেলেই।

অগত্যা পটোল আর শিঙিমাছের ভাবনা থামিয়ে আমাকে ওদেরই পিছু পিছু ছুটতে হল।

বড় রাস্তাটা আমাদের বাংলো থেকে মাইল-দেড়েক দূরে। যেতে-যেতে কাঁচা রাস্তায় আমরা মোটরের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছিলুম। এক জায়গায় দেখলুম একটা শালপাতার ঠোঙা পড়ে রয়েছে। নতুন টাটকা শালপাতার ঠোঙা। কেমন কৌতুহল হল—ওরা দেখতে না পায় এমনিভাবে চট করে তুলে নিয়ে শুকে ফেললুম। ইঃ নির্ঘাত সিঙাড়া! এখনও তার খোশবু বেরুচ্ছে।

কী ছোটলোক! সবগুলো খেয়ে গেছে। এক-আধটা রেখে গেলে কী এমন ক্ষতিটা ছিল!

—এই প্যালা—মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লি ক্যান র‍্যা?—টেনিদার হাঁক শোনা গেল।

এমনিতেই খিদে পেয়েছে—ঘ্রাণে অর্ধভোজন হচ্ছিল, সেটা ওদের সইল না। চটপট ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে আবার আমি ওদের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলুম। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। ঠোঙাটা আরও একটু শোঁকবার একটা গভীর বাসনা আমার ছিল।

বড় রাস্তায় যখন এসে পড়েছি-তখন, ভোঁক-ভোঁক। একটা লরি।

আমি হাত তুলে বলতে যাচ্ছিলুম-রোকে—রোকে—কিন্তু ক্যাবলা আমার হাত চেপে ধরলে। বললে, কী যে করিস গাড়লের মতো তার ঠিক নেই। ওটা তো রামগড় থেকে আসছে!

—ওরা তো উল্টোদিকেও যেতে পারে।

—তুই একটা ছাগল! দেখছিস না কাঁচা রাস্তার ওপর ওদের মোটরের চাকা কীভাবে বাঁক নিয়েছে। অর্থাৎ ওরা নির্ঘাত রামগড়ের দিকেই গেছে। উল্টোদিকে হাজারিবাগ-সেদিকে যায়নি।

ইস-ক্যাবলার কী বুদ্ধি! এই বুদ্ধির জন্যেই ও ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়—আর আমার কপালে জোটে লাড়ু! তাও অঙ্কের খাতায়। আমার মনে হল, লাড়ু কিংবা গোল্লা দেবার ব্যবস্থাটা আরও নগদ করা ভালো। খাতায় পেনসিল দিয়ে গোল্লা বসিয়ে কী লাভ হয়? যে গোল্লা খায় তাকে একভাঁড় রসগোল্লা দিলেই হয়। কিংবা গোটা-আষ্টেক বড়বাজারের লাড়ু। কিন্তু তিলের নাড় নয়—একবার একটা খেয়ে সাতদিন আমার দাঁত ব্যথা করেছিল।

-ঘর্‌র্‌—ঘ্যাঁস।

পাশে একটা লরি এসে থামল। কাঠ-বোঝাই। ক্যাবলা হাত তুলে সেটাকে থামিয়েছে। লরি-ড্রাইভার গলা বের করে বললে, কী হয়েছে খোকাবাবু। তুমরা ইখানে কী করছেন?

আমাদের একটু রামগড়ে পোঁছে দিতে হবে ড্রাইভার সাহেব।

—পয়সা দিতে হবে যে। চার আনা।

—তাই দেব।

—তবে উঠে পড়ো। লেকিন কাঠকে উপর বসতে হবে।

-ঠিক আছে। কাঠে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

ক্যাবলা আমাদের তাড়া দিয়ে বললে, টেনিদা—ওঠো। হাবলা আর দেরি করিসনি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন প্যালা? উঠে পড় শিগগির–

ওরা তো উঠল। কিন্তু আমার ওঠা কি অত সহজ? টেনে-হিচড়ে কোনমতে যখন লরির ওপরে উঠে কাঠের আসনে গদিয়ান হলুম—তখন আমার পেটের খানিক নুন-ছাল উঠে গেছে। সারা গা চিড়-চিড় করে জ্বলছে।

আর তক্ষুনি–

ভোঁক-ভোঁক করে আরও গোটা-দুই হাঁক ছেড়ে গাড়ি ছুটল রামগড়ের রাস্তায়। একী যাচ্ছেতাই ভাবে নড়ছে যে কাঠগুলো! কখন ধপাস করে উটে পড়ে যাই—তার ঠিক নেই। আমি সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দুহাতে মোটা কাঠের গুড়িটা জাপটে ধরলুম।

লরিটা পাঁই-পাঁই করে ছুটতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, পেল্লায় ঝাঁকুনির চোটে আমার পেটের নাড়িভূঁড়িগুলো সব একসঙ্গে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে।

মোক্ষম লাড্ডু

কাঠের লরির সে কী দৌড়। একে তো হইহই করে ছুটছে, তায় ভেতরের কাঠগুলো যেন হাত-পা তুলে নাচতে শুরু করেছে। যদিও মোটা দড়ি দিয়ে কাঠগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধা, তবু মনে হচ্ছিল কখন যেন আমাদের নিয়ে ওরা চারদিকে ছিটকে পড়ে যাবে।

জামঝাঁকানো দেখেছ কখনও? সেই যে দুটো বাটির মধ্যে পুরে ঝকরঝকর করে ঝাঁকায়—আর জামের আঁটিটাটিগুলো সব আলাদা হয়ে যায়? ঠিক তেমনি করে আমার জ্বরের পিলে-টিলে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। আমার সন্দেহ হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ পরে আমি আর পটলডাঙার প্যালারাম থাকব না—একেবারে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকচ্ছপ হয়ে যাব। মানে, সব মিলিয়ে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাব।

এর মধ্যে ঝড়াৎ-ঝড়াৎ। নাকের ওপর দিয়ে কে যেন চাবুক হাঁকড়ে দিলে। একটা গাছের ডাল।

টেনিদা বললে, ইঃ-হতভাগা ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়েই আজ মাঠে মারা যাব!

ক্যাবলা ইস্টুপিডটা এর মধ্যেও রসিকতার চেষ্টা করলে : মাঠে নয় রাস্তায়। রামগড়ের রাস্তায়।

রাস্তায়। টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, দাঁড়া না একবার, রামগড় পৌঁছে যাই। তারপর–

তারপর বললে-কোঁৎ!

মানে, ক্যাবলাকে কোঁৎ করে গিলে খাবে তা বললে না। একটা মোক্ষম ঝাঁকুনি খেয়ে ওটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

হাবুল সেন ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল : ইস, কর্ম তো সারছে। প্যাটের মধ্যে গজাদার রসগোল্লা যে ছানা হইয়া গেল।

আমি বললুম, শুধু ছানা? এর পরে দুধ হয়ে যাবে।

টেনিদা শুরু করলে : দুধ? দুধেও কুলোবে না। একটু পরে পেট ফুড়ে শিং-টিং সুষ্ঠু একটা গোরুও বেরিয়ে আসছে—দেখে নিস।

হাবুল আবার ঘ্যানঘ্যান করে বললে, হঃসত্য কইছ। প্যাট ফুইড়া গোরই বাহির হইব অখনে।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে গান ধরলে, প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হেনটাজ।

টেনিদা রেগেমেগে কী একটা বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার সেই পেল্লায় ঝাঁকুনি। টেনিদা সংক্ষেপে বললে, ঘোঁ-ঘোঁ ঘোৎ।

কিন্তু সব দুঃখেরই শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত লরি-রামগড়ের বাজারে এসে পৌঁছুল।

গাড়িটা এখন একটু আস্তে আস্তে যাচ্ছে আমরা চারজন কোনওমতে কাঠের ওপর উঠে বসেছি। হঠাৎ

—আরে ভগলু, দেখ ভাইয়া! লরিকা উপর চার লেড়কা বারকা মাফিক বৈঠল বা।

তিনটে কালোকালো ছোকরা। আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসছে।

আমি ভীষণ রেগে বললুম, তুমলোগ্ বান্দর হো! তুমলোগ বুন্ধু হো।

শুনে একজন অমনি বোঁ করে একটা ঢিল চালিয়ে দিলে একটুর জন্যে আমার কানে লাগল না। আমাদের লরির ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল, মারকে টিকি উখাড় দেব।

ছোকরাগুলোর অবশ্য টিকি ছিল না, তবু দাঁত বের করে ভেংচি কাটতে কাটতে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লরিটা আর-একটু এগোতেই ক্যাবলা বললে,–টেনিদা কুইক। ওই যে নীল মোটর।

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল রঙের মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আবার সেই গজেশ্বর। সেই ষণ্ডা জোয়ান ভয়ঙ্কর লোকটা! এর চাইতে লরির ওপরে কচ্ছপরাম হয়ে থাকলেই ভালো হত–অনেক বেশি আরাম পাওয়া যেত।

কিন্তু ক্যাবলা ছাড়বার পাত্র নয়। টেনে নামাল শেষ পর্যন্ত।

–শোন্ প্যালা। তুই আর হাবলা এই পিপুল গাছটার তলায় বসে থাক। বসেবসে ওই নীল মোটরটাকে ওয়াচ কর। আমরা ততক্ষণে একটা কাজ সেরে আসি।

লরিটা ভাড়া বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাছে থাকলে আমি আবার তড়াক করে ওটার ওপরে উঠে বসতুম–তারপর যেদিকে হোক সরে পড়তুম। কিন্তু এ কী গেরো রে বাপু! এই পিপুল গাছতলায় বসে ওয়াচ করতে থাকি, আর এর মধ্যে গজেশ্বর এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড় চেপে ধরুক।

আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাই না। হাবুল এখানে একাই সব ম্যানেজ করতে পারবে।

ক্যাবলা বললে, বেশি ওস্তাদি করিসনি। যা বললুম তাই কর বসে থাক ওখানে। গাড়িটার ওপরে বেশ করে লক্ষ রাখিস। আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব। এসো টেনিদা–

এই বলে, পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ওরা টুক করে যেন কোন্ দিকে চলে গেল।

আমি বললুম, হাবলা!

উঁ?

–দেখলি কাণ্ডটা?

হাবলা তখন পিপুল গাছের গোড়ায় বসে পড়েছে। মস্ত একটা হাই তুলে বললে : হঃ সইত্য কইছ।

–এ-ভাবে বোকার মতো এখানে বসে থাকবার কোনও মানে হয়?

হাবুল আর-একটা হাই তুলে বললে, নাঃ! তার চাইতে ঘুমানো ভালো। আমার কাঁচা ঘুমটা তোরা মাটি কইর্যা দিছস–তার উপর লরির ঝাঁকানি!–ইস–শরীরটা ম্যাজম্যাজ করতে আছে।

এই বলেই হাবুল পিপুল গাছটায় ঠেসান দিলে। আর তখুনি চোখ বুজল। বললে বিশ্বাস করবে না–আরও একটু পরে ফর ফোঁ-ফোঁ করে হাবুলের নাক ডাকতে লাগল।

কাণ্ডটা দ্যাখো একবার!

আমি ডাকলুম, হাবলা-হাবলা–

নাকের ডাক নামিয়ে হাবুল বললে, উঁ?

—এই দিন-দুপুরে গাছতলায় বসে ঘুমুচ্ছিস কী বলে?

হাবুল ব্যাজার হয়ে বললে, বেশি চিল্লাচিল্লি করবি না প্যালাকইয়া দিলাম। শান্তিতে একটু ঘুমাইতে দে। সঙ্গে সঙ্গেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর নাকের ভেতর ঘেথকে ফুড়ৎ ফুড়ুৎ করে শব্দ হতে লাগল—যেন ঝাঁক বেঁধে চড়ুই উড়ে যাচ্ছে।

কী ছোটলোক কী ভীষণ ছোটলোক! এখন আমি একা বসে ঠায় পাহারা দিই। কী যে রাগ হল বলবার নয়। ইচ্ছে করতে লাগল ওর কানে কটাং করে একটা চিমটি দিই। কিন্তু তক্ষুনি দেখলুম, তার চাইতেও ভালো জিনিস আছে। বেশ মোটা-মোটা একদল লাল পিঁপড়ে যাচ্ছে মার্চ করে। ওদের গোটাকয়েক ধরে ক্যাবলার নাকের ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে লাল পিঁপড়ে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ-

—আরে খোঁকা—তুমি এহিখানে?

তাকিয়ে দেখি, শেঠ ঢুণ্ডুরাম।

ভয়ে আমার পেটের মধ্যে এক ডজন পটোল আর দুডজন শিঙিমাছ একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। আমি একটা মস্ত হাঁ করলুম, শুধু বললুম- অ্যা অ্যা অ্যা

শেঠ ঢুণ্ডুরাম হাসলেন : রামগড়ে বেড়াইতে এসেছ? তা বেশ, বেশ। কিন্তু এহিখানে গাছের তলায় বসিয়ে কেনো? লেকিন মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বহুৎ খিদে পেয়েছে।

খিদে? বলে কী? সেই শালপাতার ঠোঙাটা শোঁকার পর থেকে আমার সমস্ত মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশ খাই, পাতাল খাই। এমন অবস্থা হয়েছে যে

www.bengaliebook.com

শেঠ ঢুণ্ডুরামের ভুড়িটাতেই হয়ত কড়াৎ করে কামড় বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সে কথা কি আর বলা যায়?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে খিদে পেয়েছে তাতে লজ্জা কী? আইসো হামার সঙ্গে। ওই দোকানে বহুৎ আচ্ছা লাড়ু মিলে–গরমাগরম সিঙাড়া ভি আছে। খাবে? হামি খিলাবো–তোমাকে পয়সা দিতে হবে না।

এই পটলডাঙার প্যালারামকে বাঘ বালুক কায়দা করতে পারে না–টেনিদার গাঁট্টা দেখেও সে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে, অঙ্কে গোল্লা খেলেও তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায় না। কিন্তু খাবারের নাম করেছ কি, এমন দুর্ধর্ষ প্যালারাম একেবারে বিধ্বস্ত।

আমি আমতা আমতা করে বললুম-লেকিন শেঠজী, গজেশ্বর–

ঢুণ্ডুরাম চোখ কপালে তুলে বললেন, গজেশ্বর? কোন্ গজেশ্বর?

আমি বললুম, সেই যে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান–হাতির মতো চেহারা আপনার গাড়িতে এসেছে–

ঢুণ্ডুরাম বললেন, রাম রাম-সীতারাম! আমি কোনও গজেশ্বরকে জানে না। আমার গাড়িতে হামি ছাড়া আর কেউ আসেনি।

–তবে যে স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি–

ঘুটঘুটানন্দ? ঢুণ্ডুরাম ভেবে-চিন্তে বললেন, হাঁ হাঁ একঠো বুড়া রাস্তায় হামার গাড়িতে উঠেছিল বটে। হামাকে বললে, শেঠজী, রামগড় বাজারে আমি নামবে। আমি তাকে নামাইয়ে দিলম। সে ইস্টেশনের দিকে চলিয়ে গেল।

এর পরে আর অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ঢুণ্ডুরাম বললে, আইসসা খোকা—আইসো। ভালো লাজু আছে—গরম সিঙাড়া ভি আছে—

আর থাকা গেল না। পটলডাঙার প্যালারাম কাত হয়ে গেল। হাবলা তখনও নাক। ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর ওর নাকের ভেতর থেকে সমানে চড়ুই পাখি উড়ছে। একবার মনে হল ওকে জাগাই—তারপরেই ভাবলুম : না—থাক পড়ে। আমি একাই গুটিগুটি ঢুণ্ডুরামের সঙ্গে গেলাম।

মস্ত খাবারের দোকান। থরেথরে লাড্ডু আর মোতিচুর সাজানো। প্রকাণ্ড কড়াইয়ে গরম সিঙাড়া ভাজা হচ্ছে। গন্ধেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়!

শেঠজী বললেন, আইসসা খোকা—ভিতরে আইসো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, গজেশ্বর কিংবা ঘুটঘুটানন্দের টিকির ডগাটিও কোথাও নেই।

ঢুকে তো পড়ি।

দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট খাবারের ঘর। বসেই শেঠজী ফরমাস করলেন, স্পেশাল এক ডজন লাড্ডু আর ছ-ঠো সিঙাড়া—

আমি বিনয় করে বললুম, আবার অত কেন শেঠজী?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে বাচ্চা খাও না! বহুৎ বড়িয়া চিজ আছে।

শালপাতায় করে বড়িয়া চিজ এল। একটা লাড্ডু খেয়ে দেখি—যেন অমৃত! সিঙাড়া তো নয়—যেন কচি পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল। আর বলতে হল না, আমি কাজে লেগে গেলুম।

গোটা চারেক লাড্ডু আর গোটা দুই সিঙাড়া খেয়েছি-এমন সময় হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। তারপর চোখে অন্ধকার দেখলুম। তারপর-

স্পষ্ট শুনলুম—গজেশ্বরের অট্টহাসি!

—পেয়েছি এটাকে। এক নম্বরের বিচ্ছু। আজই এটাকে আমি আলুকাবলি বানিয়ে খাব।

ব্যস—দুনিয়া একেবারে অথই অন্ধকার। আমি চেয়ার-টেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করে মাটিতে উলটে পড়ে গেলুম।

খেল খতম!

চটকা ভাঙতেই মনে হল, এ কোথায় এলুম?

কোথায় ঝন্টিপাহাড়ের বাংলো-কোথায় রামগড়-কোথায় কী? চারিদিকে তাকিয়ে নিজের চোখকেই ভালো করে বিশ্বাস হল না।

দেখলুম মস্ত একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছি। ঠিক চূড়ায় নয়, তা থেকে একটু নীচে। আর চূড়ার মুখে একটা উনুনের মতো—তা থেকে লকলক করে আগুন বেরুচ্ছে।

ভূগোলের বইয়ে পড়েছি...সিনেমার ছবিতেও দেখেছি। ঠিক চিনতে পারলুম আমি। বলে ফেললুম, এটা নিশ্চয় আগ্নেয়গিরি!

যেই বলা, সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন হা-হা করে হেসে উঠল। সে কী হাসি! তার শব্দে পাহাড়টা থর-থর করে কেঁপে উঠল—আর আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের শিখা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে।

চেয়ে দেখি একটু দূরে বসে তিনটে লোক হেসে লুটোপুটি। একজন শেঠ ঢুণ্ডুরাম-হাসির তালে-তালে শেঠজীর ভুঁড়িটা ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে উঠছে। তাঁর পাশেই বসে আছেন স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—হাসতে হাসতে নিজের দাড়ি ধরেই টানাটানি করছেন। আর পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতো গজেশ্বর আকাশ-জোড়া হাঁ মেলে অট্টহাসি হাসছে।

ওদের তিনজনকে দেখেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! পেটের পিলেতে একেবারে ভূমিকম্প জেগে উঠল।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, এত হাসছ কেন তোমরা? হাসির কী হয়েছে?

শুনে আবার একপ্রস্থ হাসি। আর গজেশ্বর পেটে হাত দিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ল।

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হোঃ হোঃ! আগ্নেয়গিরিই হচ্ছেন বটে। এইটা কোন্ আগ্নেয়গিরি জানো খোঁকা?

-কী করে জানব? এর আগে তো কখনও দেখিনি।

—এইটা হচ্ছেন ভিসুভিয়াস।

—ভিসুভিয়াস? —শুনে আমার চোখ কপালে উঠল। ছিলুম রামগড়ে, সেখান থেকে ভিসুভিয়াস যে এত কাছে এ খবর তো আমার জানা ছিল না!

আমি বললুম, ভিসুভিয়াস তো জার্মানিতে! না কি, আফ্রিকায়?

শুনে গজেশ্বর চোখ পাকিয়ে এক বিকট ভেংচি কাটল।

–ফুঃ, বিদ্যের নমুনাটা দ্যাখো একবার। এই বুদ্ধি নিয়েই উনি স্কুলফাইন্যাল পাশ করবেন। ভিসুভিয়াস জার্মানিতে ভিসুভিয়াস আফ্রিকায়। ছোঃ ছোঃ।

আমি নাক চুলকে বললুম তা হলে বোধহয় আমেরিকায়?

শুনে গজেশ্বর বললে, এ, এর মগজে গোরও নেই—একদম খটখটে খুঁটে। সাধে কি পরীক্ষায় গোল্লা খায়। ভিসুভিয়াস তো ইটালিতে।

–ওহো–তাও হতে পারে। তা, ইটালি আর আমেরিকা একই কথা।

—একই কথা? গজেশ্বর বললে, তোমার মুখ আর ঠ্যাং একই কথা? পাঁঠার কালিয়া আর পলতার বড়া একই কথা?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, ওর কথা ছেড়ে দাও। ওর পা-ও যা মুণ্ডুও তাই। সে মুণ্ডুতে কিছু নেই—স্রেফ কচি পটোল আর শিঙিমাছের ঝোল।

শিঙিমাছ আর পটোলের বদনাম করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি চটে বললুম, থাকুক যে, তাতে তোমাদের কী? কিন্তু কথা হচ্ছে রামগড় থেকে আমি ইটালিতে চলে এলুম কী করে? কখনই বা এলুম? টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা এরাই বা সব গেল কোথায়? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।

—পাবেও না—গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল : তারা সব হজম।

–হজম! তার মানে?

–মানে? পেটের মধ্যে, খেয়ে ফেলেছি।

—খেয়ে ফেলেছ! আমার পেটের পিলেটা একেবারে গলা বরাবর হাইজাম্প মারল : সে কী কথা!

www.bengaliebook.com

আবার তিনজনে মিলে বিকট অট্টহাসি। সে-হাসির শব্দে ভিসুভিয়াসের চূড়ার ওপর লকলকে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। আমি দুহাতে কান চেপে ধরলুম।

হাসি থামলে স্বামী ঘুটঘুটান বললেন, বাপু হে, আমাদের সঙ্গে চালাকি! পুঁটিমাছ হয়ে লড়াই করতে এসেছ হুলো বেড়ালের সঙ্গে। পাঁঠা হয়ে ল্যাং মারতে গেছ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে! যোগবলে চারটেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আর তারপরে–

শেঠজী বললেন, হাবুলকে রোস্ট পাকিয়েছি—

গজেশ্বর বললে, তোমাদের লিডার টেনিকে কাটলেট বানিয়েছি—

স্বামীজী বললেন, ওই ফরফরে ছোকরা ক্যাবলাকে ফ্রাই করেছি।

শেঠজী বললেন, তারপর খেয়ে লিয়েছি।

আমার ঝাঁটার মতো চুল ব্রহ্মতালুর ওপরে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল। বারকয়েক খাবি খেয়ে বললুম, অ্যাঁ।

স্বামীজী বললেন, এবার তোমার পালা।

—অ্যাঁ।

—আর অ্যাঁ অ্যাঁ করতে হবে না, টের পাবে এখুনি।—স্বামীজী ডাকলেন, গজেশ্বর। গজেশ্বর হাতজোড় করে বললে, জী মহারাজ।

–কড়াই চাপাও।

www.bengaliebook.com

বলতে বলতে দেখি কোত্থেকে একটা কড়াই তুলে ধরেছে গজেশ্বর। সে কী কড়াই। একটা নৌকোর মত দেখতে। তার ভেতরে শুধু আমি কেন, আমাদের চার মূর্তিকেই একসঙ্গে ঘণ্ট বানিয়ে ফেলা যায়।

–উনুনে কড়াই বসাও, ঘুটঘুটানন্দ আবার হুকুম করলেন। গজেশ্বর তক্ষুনি সোজা গিয়ে উঠল ভিসুভিয়াসের চূড়ায়। তারপর ঠিক উনুনে যেমনি করে বসায়, তেমনি করে কড়াইটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর চাপিয়ে দিলে।

স্বামীজী বললেন, তেল আছে তো?

গজেশ্বর বললে, জী মহারাজ।

–খাঁটি তেল?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, আমার নিজের ঘানির তেল আছে মহারাজ। একদম খাঁটি। থোরাসে ভি ভেজাল নেহি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ দাড়ি চুমরে বললেন, তবে ঠিক আছে। ভেজাল তেল খেয়ে ঠিক জুত হয় না–কেমন যেন অম্বল হয়ে যায়।

আমি আর থাকতে পারলুম না। হাউমাউ করে বললুম, খাঁটি তেল দিয়ে কী হবে?

–তোমাকে ভাজব। গজেশ্বর গাড়ইয়ের জবাব এল।

স্বামীজী বললেন, তারপর গরম গরম মুড়ি দিয়ে–

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, কুড়মুড় করে খাইয়ে লিব।

www.bengaliebook.com

পটলডাঙার প্যালারাম তাহলে গেল! চিরকালের মতোই বারোটা বেজে গেল তার! শেয়ালদার বাজারে আর কেউ তার জন্যে কচি পটোল কিনবে না–শিঙিমাছও না। এই তিন-তিনটে রাক্ষসের পেটে গিয়ে সে বিলকুল বেমালুম হজম হয়ে যাবে।

তখন হঠাৎ আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। কেমন স্বর্গীয় স্বর্গীয় মনের ভাব এসে দেখা দিলে। ব্যাপারটা কী রকম জানো? মনে করো, তুমি অঙ্কের পরীক্ষা দিতে বসেছ। দেখলে, একটা অঙ্কও তোমার দ্বারা হবে না–মানে তোমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। তখন প্রথমটায় খানিক দরদরিয়ে ঘাম বেরুল, মাথাটা গরম হয়ে গেল, কানের ভেতর ঝিঝি পোকা ডাকতে লাগল আর নাকের ওপরে যেন ফড়িং এসে ফড়াং ফং করে উড়তে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে প্রাণে একটা গভীর শান্তির ভাব এসে গেল। বেশ মন দিয়ে তুমি খাতায় একটা নারকোল গাছ আঁকতে শুরু করে দিলে। তার পেছনে পাহাড়–তার ওপর চাঁদ–অনেকগুলো পাখি উড়ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে সব আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি তখন। আর্টিস্ট হয়ে উঠলো।

এখানেও যখন দেখছি প্রাণের আশা আর নেই–তখন আমার ভারি গান পেল। মনে হল, আশ মিটিয়ে একবার গান গেয়ে নিই। বাড়িতে কখনও গাইতে পাইনে-মেজদা তার মোটা-মোটা ডাক্তারি বই নিয়ে তাড়া করে আসে। চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে দুচারদিন গাইতে চেয়েছি–টেনিদা আমার চাঁদিতে চাঁটি বসিয়ে তক্ষুনি থামিয়ে দিয়েছে। এখানে একবার শেষ গান গেয়ে নেব। এর আগে কখনও গাইতে পাইনি–এর পরেও তো আর কখনও সুযোগ পাব না।

বললুম, প্রভু, স্বামীজী!

স্বামীজী বললেন, কী চাই বলল? কী হলে তুমি খুশি হও : তোমায় বেসম দিয়ে ভাজবনা এমনি নুন-হলুদ মাখিয়ে?

আমি বললুম, যেভাবে খুশি ভাজুন–আমার কোনও আপত্তি নেই। কেবল একটা নিবেদন আছে। একটুখানি গান গাইতে চাই। মরবার আগে শেষ গান।

গজেশ্বর গাঁ-গাঁ করে বললে, সেটা মন্দ হবে না প্রভু। খাওয়া-দাওয়ার আগে এক-আধটু গান-বাজনা হলে মন্দ হয় না। আফ্রিকার লোকেও মানুষ পুড়িয়ে খাওয়ার আগে বেশ নেচে নেয়। লাগাও হে ছোকরা–

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হাঁ হাঁ-প্রেমসে একঠো আচ্ছা গানা লগা দেও–

আমি চোখ বুজে গান ধরে দিলুম :

একদা এক নেকড়ে বাঘের গলায়
মস্ত একটি হাড় ফুটিল–
বাঘ বিস্তর চেষ্টা করিল–
হাড়টি বাহির না হইল।

শেঠজী বিরক্ত হয়ে বললেন, ই কী হচ্ছেন? ই তো কথামালার গল্প আছেন। স্বামীজী বললেন, না হে–এতেও বেশ ভাব আছে। আহা-হা কী সুর, কী প্যাঁচামাকা গলার আওয়াজ। গেয়ে যাও ছোকরা, গেয়ে যাও।

আমি তেমনি চোখ বুজেই গেয়ে চললুম :

তখন গলার ব্যথায় নেকড়ে বাঘের
চোখ ফাটিয়ে জল আসিল,
ভ্যাঁও-ভ্যাঁও রবে কাঁদিতে কাঁদিতে
সে এক সারসের কাছে গেল–

এই পর্যন্ত গেয়েছি হঠাৎ ঝুমুর ঝুমুর করে ঘুঙুরের শব্দ কানে এল। মনে হল কেউ যেন নাচছে। চোখ মেলে যেই তাকিয়েছি–দেখি–

গজেশ্বর নাচছে।

হ্যাঁ–গজেশ্বর ছাড়া আর কে? এর মধ্যে কখন একটা ঘাগরা পরেছেনাকে একটা নথ লাগিয়েছে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছে আর ঘুরে-ঘুরে ময়ুরের মতো নাচছে। সে কী নাচ। রামায়ণের তাড়কা রাক্ষসী কখনও ঘাগরা পরে নেচেছিল কি না জানি না, কিন্তু যদি নাচত তাহলেও যে সে গজেশ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি! আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে গজেশ্বর মিটমিট করে হাসল।

বলি, কী দেখছ? অ্যাঁ-অমন করে দেখছ কী? এসব নাচ নাচতে পারে তোমাদের উদয়শঙ্কর? ছোঃ-ছেঃ! এই যে নাচছি–এর নাম হচ্ছে আদত কথাকলি।

স্বামীজী বললেন, মণিপুরীও বলা যায়।

শেঠজী বললেন, হাঁ হাঁ কত্থক ভি বলা যেতে পারে।

আমি বললুম, তাড়কা-নৃত্যও বলা যায়।

গজেশ্বর বললেন, কী বললে?

আমি তক্ষুনি সামলে নিয়ে বললুম, না না, বিশেষ কিছু বলিনি।

–তোমাকে বলতেও হবে না।ঘাগরা ঘুরিয়ে আর-এক পাক নেচে গজেশ্বর বললে, কই, গান বন্ধ হল যে? ধরো–গান ধরো। প্রাণ খুলে একবার নেচে নিই।

কিন্তু গান গাইব কী! গজেশ্বরের নাচ দেখে আমার গান-টান তখন গলার ভেতরে হালুয়ার মতো তাল পাকিয়ে গেছে।

গজেশ্বর বললে, ছোঃ-ছোঃ–এই তোমার মুরোদ। তুমি ঘোড়ার ডিমের গান জানো। শোননা–আমি নেচে নেচে একখানা ক্ল্যাসিক্যাল গান শোনাচ্ছি তোমায়।

এই বলে গজেশ্বর গান জুড়ে দিলে :

www.bengaliebook.com

এবার কালী তোমায় খাব–
হুঁ–হুঁ-তোমায় খাব তোমায় খাব–
তোমার মুণ্ডুমালা কেড়ে নিয়েই–হুঁ–হুঁ-
মুড়িঘণ্ট বেঁধে খাব–

আর সেই সঙ্গে আবার সেই নাচ। সে কী নাচ! মনে হল, গোটা ভিসুভিয়াস পাহাড়টাই গজেশ্বরের সঙ্গে ধেই-ধেই করে নাচছে! স্বামীজী তালে-তালে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন, শেঠজী বললেন, উ-হু-হু। কেইসা বঢ়িয়া নাচ। দি একেবারে ত হোয়ে গেলো!

ওদের তো দিল ত হচ্ছেনাচে গানে একেবারে মশগুল। ঠিক সেই সময় আমার পালাজ্বরের পিলের ভেতর থেকে কে যেন বললে, পটলডাঙার প্যালারাম, এই তোমার সুযোগ। লাস্ট চান্স। যদি পালাতে চাও, তা হলে

ঠিক।

এসপার কি ওসপার। শেষ চেষ্টাই করি একবার। আমি উঠে পড়লুম। তারপরেই ছুট লাগালুম প্রাণপণে। কিন্তু ভিসুভিয়াস পাহাড়ের ওপর থেকে দৌড়ে পালানো কি এতই সোজা কাজ। তিন পা এগিয়ে যেতে-না-যেতেই পাথরের নুড়িতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়লুম ধপাস্ করে।

আর তক্ষুনি–

তক্ষুনি নাচ থেমে গেল গজেশ্বরের। আর পাহাড়ের মাথা থেকে হাতকুড়ির মতো লম্বা হয়ে এগিয়ে এল গজেশ্বরের হাতটা। বললে, চালাকি। আমি নাচছি আর সেই ফাঁকে সরে পড়বার বুদ্ধি। বোঝ এইবারবলেই, মস্ত একটা হাতির শুড়ের মতো হাত আমার গলাটাকে পাকড়ে ধরল, আর শূন্যে ঝুলোতে ঝুলোতে–

www.bengaliebook.com

জয় গুরু ঘুটঘুটানন্দ। বলে আকাশ-ফাটানো একটা হুঙ্কার ছাড়ল। তারপরেই ছ্যাঁক-ঝপাস্!—সেই প্রকাণ্ড কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মধ্যে—

ফুটন্ত তেলের মধ্যে নয়—একরাশ ঠাণ্ডা জলের ভেতর। আমি আঁকুপাঁকু করে উঠে বসলাম। তখনও ভালো করে কিছু বুঝতে পারছি না। চোখের সামনে ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে ভাসছে ভিসুভিয়াস, গজেশ্বরের ঘাগরা পরে সেই উদ্দাম নৃত্য, সেই বিরাট কড়াই—সেই ফুটন্ত তেলের রাশ।

—সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়েছিল—ভরাট গম্ভীর গলায় কে বলল।

তাকিয়ে দেখি, একজন পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন পুলিশ, আর কোমরে দড়ি বাঁধা-স্বামী ঘুটঘুটানন্দ, শেঠ ঢুণ্ডুরাম আর মহাপ্রভু গজেশ্বর।

টেনিদা আমার মাথায় জল ঢালছে, হাবুল হাওয়া করছে। আর ক্যাবলা বলছে, উঠে পড় প্যালা, উঠে পড়। থানায় গিয়ে খবর দিয়েছিলুম, পুলিশ এসে ওদের দলবলসুষ্ঠু পাকড়াও করেছে। ঝণ্ডিপাহাড়ির বাংলোর নীচে বসে এরা নোট জাল করত। স্বামীজী এদের লিডার। শেঠজী নোটগুলো পাচার করত। সব ধরা পড়েছে এদের। জাল নোট ছাপার কল সব। এদের মোটরের মধ্যেই সমস্ত কিছু পাওয়া গেছে। বুঝলি রে বোকারাম, ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোয় আর ভূতের ভয় রইল না এর পর থেকে।

দারোগা হেসে বললেন, শাবাশ ছোকরার দল, তোমরা বাহাদুর বটে। খুব ভালো কাজ করেছ। এই দলটাকে আমরা অনেকদিন ধরেই পাকড়াবার চেষ্টা করছিলাম, কিছুতেই হদিস মিলছিল না। তোমাদের জন্যেই আজ এরা ধরা পড়ল। সরকার থেকে এ-জন্যে মোটা টাকা পুরস্কার পাবে তোমরা।

এর পরে আর কি বসে থাকা চলে? বসে থাকা চলে এক মুহূর্তও? আমি পটলডাঙার প্যালারাম তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলুম। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললুম : পটলডাঙা–

টেনিদা, হাবুল সেন আর ক্যাবলা সমস্বরে সাড়া দিলে : জিন্দাবাদ।